Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন: কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আজিজ

রোলঃ 228020229

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন: কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা আজিজ

রোলঃ 228020229

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন: কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা আজিজ, আইডিঃ 228020229 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন: কওমে লূতের আধুনিক সংস্করণ ও ইসলামি জবাব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

ফারহানা আজিজ

আইডিঃ 228020229

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা.....5

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কি?.....6

ট্রান্সজেন্ডার বলতে কি বুঝায়.....8

ট্রান্সজেন্ডার রূপান্তর প্রক্রিয়া.....11

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া.....13

ইন্টারসেক্স অবস্থা কখন শনাক্ত করা যায়?.....15

হরমোনগত পরিবর্তনের সাথে কি ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কোনো সম্পর্ক রয়েছে?.....15

ট্রান্সজেন্ডাররা সচরাচর সমকামী বা উভকামী.....16

ট্রান্সজেন্ডারবাদ উত্থানের ইতিহাসের.....18

ম্যাগনাস হার্শফেল্ড: সমকামী আন্দোলনের জনক.....18

হ্যারি বেঞ্জামিন.....20

এরিকসন ফাউন্ডেশন:.....21

জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনক.....23

জেন্ডার তত্ত্ব.....24

কুইয়ার তত্ত্ব : যেমন খুশি তেমন সাজো.....26

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এতো প্রভাবশালী হয়ে উঠলো যেভাবে.....28

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড যারা.....29

ফিলিপ ফ্রাই ও রুথব্লাট এর ভুমিকা.....29

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ.....31

ট্রান্সজেন্ডার বিস্ফোরণ.....31

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা.....32

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম 38

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারের মতবাদ 41

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে মিডিয়া..44

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারেএনজিও ও অ্যাক্টিভিস্ট 44

LGBTQ+ মিডিয়া সেলিব্রেটি 46

জয়া সিকদার: উত্থানের নেপথ্যে আইসিডিডিআরবি..46

তাসনুভা আনান শিশির এবং হোচিমিন তৈরীর নেপথ্যে..47

LGBTQ+ সংক্রান্ত যেসব পলিসি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে..48

ট্রান্সজেন্ডারবাদ স্বাভাবিকীকরণের ভয়াবহতা 50

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিক ও আইনী সমস্যা..51

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ 53

অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ..53

পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন..55

শিশুদের মাঝে লিঙ্গ সংশয় বৃদ্ধি 56

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বাংলাদেশে তোলপাড় 57

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান 59

যৌনতা ও যৌন বিকৃতি: ইসলামের অবস্থান..60

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ..66

সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য..67

সমকামিতা চরম- সীমালঙ্ঘন 69

শরীয়তে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার শাস্তি..71

ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে বিখ্যাত আলিমদের বক্তব্য ও ফতোয়া 73

ট্রান্সজেন্ডার লোকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি..73

উপসংহার 78

ভুমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করেছেন। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদের প্রতি, যিনি মানবজাতির রহমতস্বরূপ জাহিলিয়্যাতের আঁধার দূর করতে পৃথিবীতে আগমন করেছেন— সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

বর্তমান বিশ্বব্যাপী আলোচিত কালচারাল আগ্রাসনের অন্যতম নাম ট্রান্সজেন্ডার। পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্ব ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে মানুষকে লিঙ্গপরিচয়ের এক কঠিন সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা সমকামিতা আর অশ্লীলতা বিশ্বব্যাপী বিস্তার করতে চায়।

আগামী পৃথিবী ভয়াবহ এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও পশ্চিমা এনজিওদের প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপের মুখে সরকার পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারের অন্তর্ভুক্তি এবং নানাভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে আইনিভাবে অনুমোদন করতে যাচ্ছে। এটা বাস্তবায়িত হলে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কঠিন অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে।

ট্রান্সজেন্ডার বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশে মহিলারা পুরুষ হতে পারবে আর পুরুষেরা মহিলা হতে পারবে। আমাদের সন্তানদের মগজ ধোলাই হয়ে যাবে। নারী আর পুরুষের সীমারেখা মুছে যাবে। পর্দা মুছে যাবে। অবৈধ ও বিকৃত যৌনতা সহজলভ্য হবে। জিনা-ব্যভিচার ও সমকামিতা ছড়িয়ে পড়বে। বিবাহপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। জারজ সন্তানে দেশ ভরে যাবে। উত্তরাধিকার ব্যবস্থা ভেঙে যাবে। পরিবারের বন্ধন ভেঙে যাবে। যুবক-যুবতীরা পরিবারের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। তারা অবৈধ যৌনতায় ডুবে যাবে। যে কোনোভাবে মজা করাই জীবনের উদ্দেশ্য হবে। সন্তান বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে পড়বে। এসব অনাচারে বাবা-মায়েরা বাধা দেওয়ার অধিকার হারাবে। তারা এগুলো বৈধতা দিতে গণতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার বুলি আওড়াবে। আমাদের সন্তানদের জন্য কি আমরা এমন ভবিষ্যৎ চাই...???

মুসলমান যুবকরা জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলবে। ইসলামের মূল্যবোধ মুছে যাবে। জমিনে আল্লাহর বিধানের পক্ষে কথা বলার মতো মানুষের সংখ্যা কমে যাবে। মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ধ্বংস করার জন্য ট্রান্সজেন্ডারই হাজার এজেন্ডার কাজ করবে।

সুতরাং জনগণকে সচেতন করতে এ ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষের কথা বলা জরুরি। সমাজের যারা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ আছেন, কিংবা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদরা আছেন, তাদের এ বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ তোলা প্রয়োজন মনে করি।

সমাজের মানুষকে সচেতন করতেই এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াস। এখানে পশ্চিমা চিন্তার অসারতা ও ট্রান্সজেন্ডারবাদের আড়ালে সমকামিতার বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। হিজড়া বা ট্রান্সজেন্ডার যে এক নয়, সেটিও স্পষ্ট করা হয়েছে। সবশেষে হিজড়া, ট্রান্সজেন্ডার বা সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করছি সমাজের মানুষ কে সচেতন করতে প্রবন্ধ টি সহযোগিতা করবে। মহান আল্লাহ কবুল করুন।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কি?

অনেকে একে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ পরিচয় মতবাদও বলে থাকেন। এটাই এখন পশ্চিমা বিশ্ব ছাপিয়ে আমাদের সমাজ ধ্বংস করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। তাই সকলেই এ বিষয়টি জানা ও সচেতন হওয়া দরকার।

এই মতবাদ অনুসারে লিঙ্গ একটি সামাজিক ধারণা। একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবি করে, তাহলে সে নারী হতে পারে। যদিও সেই পুরুষ শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক, তার পুরুষাঙ্গ আছে, সন্তানের বাবা হওয়ার মতো সক্ষমতা আছে, তিন বাচ্চার বাপ হয়েছে, তাতে কিছু আসে-যায় না। তারপরেও সে নারী। সমাজ ও আইন নারী হিসেবেই তাকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ সে নারী হিসেবে পরিচিত হতে চায়, এটাই যথেষ্ট।
আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে, তাহলে সে পুরুষ। যদিও সে শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ নারী, তার নিয়মিত মাসিক হয়, সে সন্তানের মা হওয়ার মতো সক্ষমতা আছে, সে গর্ভবতী হয়, ইতিমধ্যে সে তিনটা বাচ্চার মা হয়েছে, তার পরেও সে পুরুষ। কারণ সে পুরুষ হিসেবে পরিচিত হতে চায়, এটাই যথেষ্ট। সমাজ ও আইন পুরুষ হিসেবেই তাকে বিবেচনা করতে

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ তার অবস্থানকে ব্যাখ্যা করার জন্য চারটা ধারণাকে ব্যবহার করে-

- বায়োলজিকাল সেক্স (Biological Sex) বা জন্মগত লিঙ্গ
- সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন (Sexual Orientation) বা প্রণয়বোধ ও যৌন আকর্ষণ
- জেন্ডার
- জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ/'মনের লিঙ্গ')

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে এই চারটা জিনিস আলাদা। তারা কীভাবে এ চারটিকে সংজ্ঞায়িত সেটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। তারা বলে,

বায়োলজিকাল সেক্স বা জন্মগত লিঙ্গ হলো স্রেফ দেহের বর্ণনা। মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, যেমন ক্রোমোসোম, যৌনাঙ্গ, হরমোন ইত্যাদি মিলে তার জন্মগত লিঙ্গ ঠিক হয়। কিছু মানুষের পুরুষাঙ্গ থাকে, কিছু মানুষের যোনী থাকে। কিন্তু এগুলো দিয়ে; দেহ দিয়ে মানুষের পরিচয় ঠিক হয় না।

সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন হলো মানুষের যৌন রুচি বা আকর্ষণ। যৌন আকর্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এক্ষেত্রে ভালোমন্দ, ভুল কিংবা সঠিক বলে কিছু নেই। কেউ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কেউ আকৃষ্ট হতে পারে উভয়ের প্রতি। আবার কারো মধ্যে হয়তো যৌনতার কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। যৌন রুচি একটা বর্ণালীর মতো। এখানে আছে অনেক রঙ। পুরুষ হলেই নারীর প্রতি বা নারী হলেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই।

জেন্ডার হলো নারী বা পুরুষ হবার সাথে যুক্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা। সমাজ ও সংস্কৃতি নারীর কাছ থেকে বিশেষ কিছু আচরণ আশা করে, আলাদা ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে পুরুষের কাছ থেকে। নারী ও পুরুষের কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ধারণা থাকে। কিন্তু এই ধারণা আর দৃষ্টিভঙ্গিগুলো মানুষের বানানো। সর্বজনীন কিছু না।

জেন্ডারও আসলে একটি বর্ণালীর মতো। নারী বা পুরুষ হবার নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। কেউ নিজেকে নারী পুরুষ, দুটোই, কোনোটাই না অথবা এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনো কিছু হিসেবে পরিচয় দিতে পারে। সবই সমান, সবই বৈধ।

জেন্ডার আইডেন্টিটি বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ হলো নিজের ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি। কারো দেহ পুরুষের হতে পারে কিন্তু সে নিজেকে নারী মনে করে এবং নিজেকে নারী হিসেবে

প্রকাশ করে। সে নারীসুলভ নাম ব্যবহার করে, পোশাক পরে ইত্যাদি। নিজেকে নারী মনে হওয়াটা হলো মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বা জেন্ডার আইডেন্টিটি। আর নিজেকে নারী হিসেবে প্রকাশ করাটা হলো জেন্ডার এক্সপ্রেশন (Gender Expression) বা মনের লিঙ্গের বহিঃপ্রকাশ।

একজন মানুষ নিজেকে যা মনে করে সমাজ ও আইন তাকে সেটাই গণ্য করবে। অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গের উপর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ প্রাধান্য পাবে। তাই পুরুষাঙ্গ থাকলেও কেউ 'নারী' হতে পারে, যোনী থাকলেও কেউ পুরুষ হতে পারে। এই চারটি ধারণা কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এগুলোর মাধ্যমে মানুষের পরিচয় তৈরি হয়, সেটা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করা হয়।

জেন্ডারবাদের মতে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ তার জন্মের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না কিংবা আল্লাহ প্রদত্ত যৌনাঙ্গ দ্বারাও লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। এটি জন্মগত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কিত নয়। লিঙ্গ নির্ধারিত হয় নিজের মনের ইচ্ছার ভিত্তিতে। একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী তা তার দেহের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের দেহ তার পরিচয় বহন করে না। পরিচয় বহন করে মানুষের মন।

এটি একধরনের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস বা মানসিক অবস্থা, যার ওপর ভিত্তি করে সে নিজের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। কোনো পুরুষ যদি 'নিজেকে নারী বলে মনে করে' তাহলে সে নারী। সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় আইন তাকে নারী হিসেবেই বিবেচনা করবে। আবার কোনো নারী যদি 'নিজেকে পুরুষ মনে করে' তাহলে সে পুরুষ। সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় আইন তাকে পুরুষ হিসেবেই বিবেচনা করবে। জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, সেটা কোনো বিবেচনার বিষয় নয়, যে পরিবর্তন হতে চায়, তার মনটাই বিবেচ্য বিষয়।

ট্রান্সজেন্ডার বলতে কি বুঝায়

ট্রান্স শব্দের অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর এবং জেন্ডার শব্দের অর্থ লিঙ্গ। ফলে ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'লিঙ্গ পরিবর্তন'। সোজা বাংলায় ট্রান্সজেন্ডার মানে বিপরীত লিঙ্গের অনুকরণ।

ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৬৫ সালে। এ শব্দ দিয়ে এমন মানুষকে বোঝানো হয়, 'যারা মনে করে তাদের জন্মগত লিঙ্গ তাদের দেহের সাথে মেলে না।' 'জন্মগত দেহ যা-ই হোক না কেন, একজন মানুষ নিজেকে যে পরিচয়ে দেখতে চায় সেটাই তার লিঙ্গ।' বিষয়টি এতটাই তরল যে, একজন ব্যক্তি সকালে নিজেকে পুরুষ আবার বিকেলে নিজেকে নারী দাবি করতে পারে। কারও দেহটা পুরুষের মতো হলেও কিন্তু সে নিজেকে নারী ভাবতে ভালো লাগে অথবা কারও দেহটা নারীর মতো, তারপরও সে নিজেকে পুরুষ ভাবতে ভালো লাগে। এই ভাবতে ভালো লাগা এবং নিজেকে সে মোতাবিক পরিবর্তন করে ফেলার নামই ট্রান্সজেন্ডার।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞায় বলছে, কারও মানসিক অনুভূতি জন্মগত লিঙ্গের সাথে মিল না হলে তবেই সে ট্রান্সজেন্ডার। যাদের সামাজিক লৈঙ্গিক পরিচয় (স্ত্রী লিঙ্গ, পুরুষ লিঙ্গ বা অন্যান্য) থেকে জন্মগত যৌনপরিচয় আলাদা, এমন মানুষ ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচিত। সহজ কথায়, কারও জন্মগত যৌনপরিচয়ের সঙ্গে যখন সামাজিক লৈঙ্গিক পরিচয়ের অমিল হয়, তখন তাকে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
অর্থাৎ জন্মের সময় তার শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে যে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, পরবর্তী সময়ে ভেতরগত অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার কারণে সে নিজের সেই জন্মগত লিঙ্গকে গ্রহণ করতে চায় না। সেটাকে অস্বীকার করে। জন্মগত শারীরিক গঠন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মানসিক এই অসুস্থ অবস্থাটাকেই ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। কোনো কোনো ট্রান্সজেন্ডার মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে এই অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং কোনোভাবেই সে নিজের প্রকৃত লৈঙ্গিক অবস্থাকে মেনে নিতে চায় না। চিকিৎসাবিদ্যার ভাষায় ট্রান্সজেন্ডারের মানসিক এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় জেন্ডার ডিজফোরিয়া (Gender Dysphoria) বা জেন্ডার আইডেন্টি ডিসোর্ডার (Gender identity disorder (GID)।

কাজেই ট্রান্স-নারীর মানে হলো, এমন পুরুষ যে নিজেকে নারী দাবি করছে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করেছে। আর ট্রান্স-পুরুষ মানে হলো একজন নারী, যে নিজেকে পুরুষ বলে দাবি করছে এবং সে অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করেছে, সেটাই হবে তার সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়।

ট্রান্সজেন্ডারেরা মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে অসন্তুষ্ট। তারা নাকি ভুল দেহে জন্মগ্রহণ করেছে। তার মন এক রকম আর দেহ আরেক রকম। তাই মন যে রকম সে রকম লিঙ্গ নির্বাচন করে। কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে, তাহলে সে একজন পুরুষ। আবার কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে, তাহলে সে মূলত একজন নারী।

তাই ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে, যারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেও কেবল খেয়ালখুশির বশে বিপরীত লিঙ্গের মতো হতে চায়। এটাই হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারের মূল কথা। কিন্তু এ মূল কথার ভিতরে আরও অনেক বিষয় লুক্কায়িত আছে, যা উম্মাহর কাছে অতি দ্রুত উপলব্ধ হওয়া দরকার।
প্রকৃতপক্ষে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। মানুষের জন্ম হওয়ার জন্য বাবার শুক্রাণু এবং মায়ের ডিম্বাণু মিলিত হয়ে প্রথমে জাইগোট নামক একটি কোষ তৈরী হয়, তখনই একজন মানুষের সেক্স বা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এটা একটা প্রাকৃতিক জৈব প্রক্রিয়া। তাই কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী হিসেবে দেখতে পছন্দ করে কিংবা কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ হিসেবে দেখতে পছন্দ করে, এটি একটি মানসিক বৈকল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জন্য প্রয়োজন মানসিক চিকিৎসা। কিন্তু পশ্চিমা সমাজ চিকিৎসাকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলার এজেন্ডা নিয়ে মাঠে নেমেছে। কারণ এর মাধ্যমে তাদের সমকামিতার মিশন লুকিয়ে আছে।

একসময় ট্রান্সজেন্ডার বলা হতো যারা হরমোন এবং সার্জারির আশ্রয় নিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করত। তবে বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার সার্জারির ওপর নির্ভর করে না। কেউ কেউ সার্জারি বা হরমোন ট্রিটমেন্ট করে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে, আবার কেউ অস্ত্রপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করতে পারে। বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার হচ্ছে এক গুচ্ছ শব্দ। এটি এলজিবিটি এবং নন-বাইনারি নামক শব্দের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা বিষমকামী (হেটেরোসেক্সচুয়াল), সমকামী (হোমোসেক্সচুয়াল), উভয়কামী (বাইসেক্সচুয়াল) হতে পারে। ট্রান্সজেন্ডারা বিশ্বব্যাপী সমকামিতাকে জনপ্রিয় করার জন্য রেইনবো রঙ্গের পতাকা ব্যবহার করে।

ট্রান্সজেন্ডার রূপান্তর প্রক্রিয়া

একসময় ট্রান্সজেন্ডার হতে হলে হরমোন এবং সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তর করা হতো। বর্তমানে এ প্রক্রিয়া অনেক সহজতর করা হয়েছে। এখন হরমোন এবং সার্জারি ছাড়াই কেউ ইচ্ছে করলেই ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে। যিনি ট্রান্সজেন্ডার হতে চায়, এ ইচ্ছেটাই এ জন্য যথেষ্ট।

ট্রান্সজেন্ডার এলজিবিটি (LGBT) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলজিবিটি সমকামিতা বা হোমোসেক্সচুয়ালিটির সাথে জড়িত। এলজিবিটি মুভমেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম GLAAD; তাদের মতে নিম্নোক্ত তিনভাবে মানুষ ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে-

(ক) সামাজিক রূপান্তর

প্রত্যেক মানুষের একটি সামাজিক পরিচয় রয়েছে। যেমন একজন নারী, তার একটি নারী সূলভ নাম রয়েছে। সে শাড়ি পরে, গহনা পরে, তার স্বামী আছে ইত্যাদি এবং সমাজ তাকে নারী হিসেবে চেনে। এখন জন্মগতভাবে পুরুষ লিঙ্গের কেউ ট্রান্স-নারী হতে চাইলে সে সামাজিক এ বিষয়গুলো পরিবর্তন করবে। সে মেয়েদের মতো নাম রাখবে, নিজেকে নতুন নামে সম্বোধন করাবে, মেয়েদের পোশাক পরবে, মেয়েদের মতো মেকআপ করবে, অলংকার পরবে, মেয়েদের মতো জুতা পরবে, লিপস্টিক মাখবে, ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে নিজেকে মেয়ে হিসেবে পরিচয় করাবে। সমাজ এবং রাষ্ট্র তাকে মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। তার শরীরে পুরুষ পেনিস থাকলেও তাতে কোনো সমস্যা নেই; কিংবা সে যদি তিন সন্তানের বাবা-ও হয়ে থাকে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

নারী দেহে জন্ম নেওয়া কেউ যদি ট্রান্স-পুরুষ হতে চায়, তাহলে সে পুরুষের মতো নাম রাখবে, নিজেকে পুরুষ হিসেবে সম্বোধন করাবে, পুরুষের মতো পোশাক পরবে, পুরুষের মতো মেকআপ করবে, ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজে নিজেকে পুরুষ হিসেবে পরিচিত করাবে। এভাবে সমাজকে জানানোর মাধ্যমে ট্রান্সজেন্ডার হতে পারবে। সমাজ এবং রাষ্ট্র তাকে পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। তার শরীরে স্ত্রী যৌনাঙ্গ থাকলে তাতেও কোনো সমস্যা নেই কিংবা সে যদি তিন সন্তানের মা হয়ে থাকে, তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

(খ) আইনগত রূপান্তর

সকল মানুষই কিছু আইনগত ডকুমেন্ট ধারণ করে, যাতে তার জেন্ডার উল্লেখ থাকে। কেউ ট্রান্সজেন্ডার হতে চাইলে সে সকল কাগজপত্রে তার জেন্ডার পরিবর্তন করে নিতে হবে। এ সকল কাগজপত্র-যেমন: জন্মসনদ, ন্যাশনাল আইডিকার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড, ব্যাংক একাউন্টের নাম ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে জেন্ডার আইডেন্টিটি পরিবর্তনের জন্য আবেদন করে সেগুলো পরিবর্তন করে নিতে পারে। যেমন পুরুষ হলে নারী কিংবা নারী হলে পুরুষ হিসেবে আইডেন্টিটি গ্রহণ করে আইনগতভাবে ট্রান্সজেন্ডার হতে পারবে। এ প্রক্রিয়ায়ও রূপান্তরকৃত একজন ট্রান্স-নারী নারীর সঙ্গে মিল রেখে পোশাক পরিধান করবে। তাতে তার শরীরে পুরুষ-যৌনাঙ্গ থাকতে পারে, সেটি কোনো সমস্যা নয়। আবার একজন ট্রান্স-পুরুষ পুরুষের সঙ্গে মিল রেখে পোশাক পরিধান করলেও তার শরীরে স্ত্রীযৌনাঙ্গ থাকতে পারে।

(গ) মেডিকেল রূপান্তর

সার্জারি বা অস্ত্রপচার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায়। অস্ত্রপচার করে মহিলা থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে মহিলায় রূপান্তর করা হয়। এ পদ্ধতিতে যৌনাঙ্গের টিস্যুকে নতুন করে আকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
পুরুষ থেকে ট্রান্স-মহিলা রূপান্তরের জন্য ভ্যাজিনোপ্লাস্টি, ব্রেস্ট অগমেন্টেশন সার্জারি, ফেসিয়াল ফেমিনাইজেশন এবং অন্যান্য সার্জারির প্রয়োজন হয়। সার্জারির মাধ্যমে পুরুষ যৌনাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তির লিঙ্গ ও অণ্ডকোশ অপসারণ করা হয়। অণ্ডকোশের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে একটি ছোট কৃত্রিম যোনি স্থাপন করা হয়। কখনো কখনো কৃত্রিম স্তনও স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এ ব্যক্তিকে হরমোন থেরাপি এবং কাউন্সেলিং দেওয়া হয়। প্রচুর পরিমাণে মেয়েলি হরমোন দেওয়ার ফলে কণ্ঠস্বর কিছুটা নরম হয় এবং দেহে ফ্যাট তৈরী হয়ে নারীর দেহের প্রাথমিক কিছু বৈশিষ্ট্য তার শরীরে দৃশ্যমান হয়। এতে করে বাহ্যিক আকৃতিতে তিনি নারীর মতো মনে হলেও বাস্তবে তিনি পুরুষই থাকেন।
আমেরিকা এবং ব্রিটেনের ডাটা অনুযায়ী শরীর বা মুখের অবয়ব পরিবর্তন করা হলেও কমপক্ষে ৯৭% ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডারদের যৌনাঙ্গ (পেনিস বা যোনি) অক্ষত থাকে। কেবল তাদের শরীরের উপরের অংশ মুখাবয়ব, স্তন, শারীরিক কমনীয়তা ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়। তবে কৃত্তিম জরায়ু সংযোজন করা হলেও তার ঋতুস্রাব হয় না এবং তা দিয়ে সন্তান গর্ভ ধারণ করানো যায় না।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া

আমাদের সমাজে হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের ধারণা আছে। ট্রান্সজেন্ডারবাদে কথা শুনলে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এটা হয়তো হিজড়াদের অধিকার নিয়ে কোনো আন্দোলন। কিন্তু এ দুটো জিনিস একেবারেই আলাদা। আসুন পুরো ব্যাপারটা ভেঙে ভেঙে দেখা যাক, ঠিক কোন কোন জায়গাতে ভুলগুলো হচ্ছে।

মানুষ হয় পুরুষ অথবা নারী। যাদের দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা পুরুষ, যাদের দেহ ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি তারা নারী। এটা শুধু বাহ্যিক 'যন্ত্রপাতি'র বিষয় না। পুরো প্রজননব্যবস্থার বিষয়।

মানবজাতির মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ আছেন যাদের প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। বাহ্যিকভাবে তাদের দেহে জন্মগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। এধরনের মানুষকে বোঝাতে যে শব্দটা ব্যবহৃত হয় তা হলো ইন্টারসেক্স (Intersex) বা আন্তঃলিঙ্গ। বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে মূলত ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষদের বুঝিয়ে থাকে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী জনসংখ্যার মাত্র ০.০১৮% মানুষ ইন্টারসেক্স বা হিজড়া হন। ৯৯.৯৮২% মানুষ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে জন্ম নেন।

যে বিষয়টা আমাদের বোঝা দরকার তা হলো, ইন্টারসেক্স বা আন্তলিঙ্গ মানুষরা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ না বা দুটোর মাঝামাঝি কিছুও না। তারাও নারী অথবা পুরুষ, তবে তাদের যৌন অঙ্গ, গঠন বা জিনগত কিছু ত্রুটি থাকে। যে কারণে এ ধরনের সমস্যাকে ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট (ডিএসডি)-ও বলা হয়।

যেমন, ধরা যাক একটি শিশুকে জন্মের সময় বাহ্যিকভাবে মেয়ে মনে হয়েছে, সেভাবেই সে বড় হয়েছে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় দেখা গেল তার মাসিক হচ্ছে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হলো, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল তার জরায়ু নেই, ফ্যালোপিয়ান টিউব নেই; বরং শরীরের ভেতরে অণ্ডকোষ আছে। তার শরীর পুরুষের হরমোন তৈরি করছে, তার শরীর শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি। ইনি একজন ইন্টারসেক্স পুরুষ, যার শরীরে বাহ্যিকভাবে নারীসুলভ কিছু চিহ্ন আছে।

অন্যদিকে নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স না। তাদের কোনো ধরনের ডিএসডি (ডিসঅর্ডার অফ সেক্স ডেভেলপমেন্ট) নেই। তাদের জন্ম হয়েছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক যৌনাঙ্গ নিয়ে।

যারা নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার নারী দাবি করে তারা পুরুষ। তাদের অণ্ডকোষ আছে, পুরুষাঙ্গ আছে, তাদের শরীরে আছে এক্সওয়াই ক্রোমোসোম। নিজেদের যারা ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ বলছে

তারা আসলে নারী। তাদের জন্ম জরায়ু, ডিম্বাশয়, যোনী এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব নিয়ে। তাদের দেহে আছে এক্সএক্স ক্রোমোসোম। যারা সত্যিকার অর্থে আন্তলিঙ্গ তাদের খুব অল্প সংখ্যকই নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার বলে দাবি করে।

একটি শিশুর ছেলে বা মেয়ে হওয়া তার পিতামাতার মিলনের সময়েই নির্ধারিত (Sex determined) হয়ে যায়। বাবা থেকে আসে শুক্রাণু (Sperm) আর মা থেকে আসে ডিম্বাণু (Oocyte)| ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু মিলিত হয়ে (Fertilization) জাইগোট তৈরি হয় এবং এই একটিমাত্র কোষ থেকে মাতৃগর্ভে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি হয়ে পূর্ণাঙ্গ ছেলে বা মেয়ে হিসেবে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে।
জেনেটিক পর্যায়ে শুক্রাণু বহন করে X অথবা Y ক্রোমোজোম। অন্যদিকে ডিম্বাণু শুধু X ক্রোমোজোম বহন করে। ক্রোমোজমের বিন্যাস XY হলে শিশুটি হবে ছেলে এবং XX হলে শিশুটি হবে মেয়ে। ছেলেমেয়ের এই লিঙ্গ নির্ধারণ সিস্টেমকে বাইনারি বলা হয়। কেননা এতে শুধু দুটি অপশন রয়েছে। এটি বায়োলজিক্যালি বা প্রকৃতিগতভাবে খুবই সুস্পষ্ট এবং প্রতিষ্ঠিত সিস্টেম। জন্মের সময় ৯৯.৯৮% ক্ষেত্রে হয় ছেলে, নয়তো মেয়ে। ব্যতিক্রম হিসেবে XY বা XX ক্রোমোজোমের বিন্যাস ঠিক থাকার পরও জিনগত ত্রুটির (মিউটেশন) কারণে ছেলে এবং মেয়েদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যে হেরফের হতে পারে।
ছেলে ও মেয়ের শারীরিক গঠন এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে দুটো হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এগুলোকে সেক্স হরমোন বলা হয়। ছেলেদের শারীরিক গঠন ও যৌনতা বিকাশে অ্যান্ড্রোজেন এবং নারীদের ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন হরমোন দায়ী। এই দুটো হরমোনের পরিমাণগত পার্থক্য হলে ছেলে এবং মেয়েদের বৈশিষ্ট্যগত আংশিক বা পুরোপুরি উলটপালট (ছেলেকে দেখতে মেয়ের মতো, আবার মেয়েকে দেখতে ছেলের মতো) হয়ে যেতে পারে। যেসমস্ত শিশুদের জেনোটাইপের (XY ও XX chromosome) সাথে সাথে ফেনোটাইপিক বৈশিষ্ট্য (বাহ্যিকভাবে ছেলেমেয়েদের সে বৈশিষ্ট্যগুলো খালি চোখে বোঝা যায়) তথা বহিঃযৌনাঙ্গের (External genitalia) অসামঞ্জস্য (অমিল) থাকে, তাদেরকে প্রকৃত ইন্টারসেক্স বা 'উভয় লিঙ্গ মানব' বলা হয়। এগুলো খুবই বিরল ঘটনা। জিন বা হরমোনগত ত্রুটির কারণে আরও বিভিন্ন ধরনের যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ইন্টারসেক্স অবস্থা কখন শনাক্ত করা যায়?

যেসব শিশুর অস্পষ্ট যৌনাঙ্গ বিদ্যমান থাকে, তাদের ক্ষেত্রে 'ইন্টারসেক্স অবস্থা' জন্মের পরপরই শনাক্ত করা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো বয়ঃসন্ধি তথা পিউবার্টির সময় প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার কারও কারও ক্ষেত্রে ২০-২৫ বছর পরেও দেখা দিতে পারে। সমস্যা হলো, ছোটবেলা থেকে কোনো শিশু ছেলে বা মেয়ে হিসেবে বড় হতে হতে বয়ঃসন্ধিকালের সময় হরমোনগত পরিবর্তনের কারণে কখনো বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য তার মাঝে চলে আসতে পারে। এক্ষেত্রে 'ইন্টারসেক্স মানুষ' বাহ্যিকভাবে দেখতে পুরোপুরি নারী বা পুরুষের মতো হলেও সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা তার থাকে না। এমনকি এই সময়ে তাকে সামাজিক অসচেতনতার কারণে 'লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হওয়ার ধাক্কা মেনে নিতে অনেক বেগ পেতে হয়; অনেকে সামাজিকভাবে অবজ্ঞার শিকারও হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে প্রায়ই মূলধারার মিডিয়াতে এই ধরনের ঘটনাগুলো নিয়ে শিরোনাম হতে দেখা যায়। তবে ইদানীংকালে এই বিষয়ে এমনভাবে প্রতিবেদন ছাপানো হতে দেখা যাচ্ছে, যেগুলো পাঠ করে একজন সাধারণ মানুষ 'ইন্টারসেক্স' ও 'ট্রান্সজেন্ডার' বিষয় দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যেকোনো শারীরিক বা মেডিক্যাল সমস্যার (যেমন- হরমোনের কমবেশি হওয়া) কারণে কেউ কখনো ট্রান্সজেন্ডার হয় না; এই ব্যাপার পুরোটাই মানসিক ইস্যু। খেয়াল করলে দেখবেন, এই ইন্টারসেক্স হওয়ার ঘটনাগুলো বয়ঃসন্ধির সময়কালে ঘটে, যখন একজন মানুষের সেক্স হরমোন তৈরি হওয়া শুরু হয়।

হরমোনগত পরিবর্তনের সাথে কি ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো- 'না, নেই'। কয়েক বছর আগেও কেউ কেউ বিশ্বাস করত, ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার পেছনে হরমোনগত সমস্যা দায়ী হতে পারে। তবে এই ধারণা সত্যি কিনা, তা জানার জন্য আমেরিকার একদল গবেষক ১০১ জন ট্রান্সজেন্ডারের ওপর গবেষণা করে তাদের ফলাফল Journal of Adolescent Health নামক জার্নালে (২০১৫ সালে) প্রকাশ করে। সেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসে যে, ট্রান্সজেন্ডার হওয়ার সাথে হরমোনের তারতম্য ঘটে না। গবেষক দলের প্রধান মন্তব্য করেন, 'We've now put to rest the residual belief that transgender experience is a result of a hormone imbalance,' says Olson. 'It's not।' তাই ট্রান্সজেন্ডার হওয়া পুরোপুরি মানসিক বিষয়, যার সাথে শারীরিক কোনো সম্পর্ক নেই। যদি জন্মগত সমস্যাই হতো, তবে অসুস্থতা মানুষের জেন্ডার আইডেন্টিটি মুভমেন্ট হিসেবে এত দূর আসত না, বিশ্বে এটা ইস্যুই হতো না।

ট্রান্সজেন্ডাররা সচরাচর সমকামী বা উভকামী

সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণের কারণে ট্রান্সজেন্ডাররা সচরাচর রূপান্তর প্রক্রিয়ার (যেমন সামাজিক, মেডিকেল ও আইনি রূপান্তর বা ট্রাঞ্জিশন) মধ্য দিয়ে যান। অন্যদিকে গে, লেসবিয়ান এবং উভকামীরা নিজেদের যথাক্রমে জন্মগত ছেলে (XY) বা মেয়ে (XX) হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। ট্রান্সজেন্ডারবাদে কারো সম্পূর্ণ সক্ষম পুরুষাঙ্গ থাকার পরেও যদি নিজেকে নারী দাবি করে, তবে তাকে আইনত এবং সামাজিকভাবে নারী হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার নারীরা (XY) অন্য জন্মগত ও জৈবিকভাবে পুরুষকে (XY) পছন্দ করে। তাই, এখানে যৌন সম্পর্কের দিক থেকে সমকামিতা (XY, XY) হবে। সেই ট্রান্সজেন্ডার নারী (সার্জারী করে অবিকল নারীর মত দেখায়) যদি অন্য নারীকে বিয়ে করতে চায় তবে তারা এটাকে সমাজের চোখে সমকামিতা (লেসবিয়ান) হিসেবে দেখাতে চায়। সাম্প্রতিকালে Transwoman-কে মিডিয়াতে শুধু Woman হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

২০২৩ সালে BMC Public Health জার্নালে ট্রান্সজেন্ডারদের যৌনসঙ্গী (Sexual partner) নিয়ে ১৪৩৬ জন আমেরিকান (ট্রান্সজেন্ডার ২৭৮ জন, এবং সিসজেন্ডার অর্থাৎ জন্মগত লিঙ্গ পরিচয় দানকারী ১১৬২ জন) একটা গবেষণায় অংশগ্রহণ করে। ৫ বছরব্যাপী তাদের যৌনসঙ্গী কোন লিঙ্গের ছিলো তা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ডেটা অনুযায়ী- ট্রান্সজেন্ডার পুরুষরা (জন্মগত নারী) বায়োলিজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে ৭৬% সমকামী যৌন (XX, XX) সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যদিও তারা ট্রান্সজেন্ডারবাদ অনুযায়ী নিজেদের হেটেরোসেক্সুয়াল বা অসমকামী দাবী করে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডাররা রূপান্তরিত লিঙ্গ পরিচয়কেই মূল পরিচয় হিসেবে দাবী করে (Transwomen are women; Transmen are men) তাদের অনেকে আবার উভকামী যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (জন্মগত পুরুষ) মাঝে সমকামী (XY, XY) সম্পর্ক ছিল ৬৭% এর ক্ষেত্রে। ২০২১ সালে ৯০২ জন ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে (ট্রান্সজেন্ডার নারী ৪৬৯ এবং ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ ৪৩৩) আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে ৮০% ট্রান্সজেন্ডার সমলিঙ্গের প্রতি বেশী যৌন আকর্ষণ অনুভব করে, অর্থাৎ সমকামী। ইরানের এক স্টাডিতে দেখা গেছে সার্জারী করা ট্রান্সজেন্ডারদের ৯৭% সমকামী যৌন জীবনে অভ্যস্ত। ভারতের এক গবেষণায় দেখা গেছে ৭৩% ট্রান্সজেন্ডার পায়ুকামী (১৯)। ২০১৩-২০১৪ সালের ইউরোপের গবেষণা অনুযায়ী ৪৬ থেকে ৮০% ট্রান্সজেন্ডার নিয়মিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত এবং এদের বেশীর ভাগ সমকামী যারা পায়ুকাম করে।

বিসিসি'র এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন (The lesbians who feel pressured to have sex and relationships with trans women) নিয়ে ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে তোলপাড় হয়। ট্রান্সজেন্ডার নারীদের (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কেউ কেউ প্রকৃত নারীদের (যারা লেসবিয়ান) সাথে লেসবিয়ান (নারী সমকামী) হিসেবে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। কিন্তু প্রকৃত লেসবিয়ান নারীরা তাদের সাথে মিলিত হতে চান না, চাপ অনুভব করেন কেননা সেসব ট্রান্সজেন্ডার নারীদের পুরুষাঙ্গ (পেনিস) রয়েছে।

কিছু বিরল কেইসও রয়েছে। ট্রান্সজেন্ডারা প্রকৃত বিষমকামী/অসমকামী সম্পর্কও গড়ে তুলতে পারে। কল্পনা করুন- দুজন স্বাভাবিক পুরুষ-নারীর হঠাৎ মনে হলো তারা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে লিঙ্গবৈশিষ্ট্য অদল-বদল করবে। অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের সাজগোজ ও চিকিৎসার মাধ্যমে নিজেদের রূপান্তরিত করে ফেলল এবং তারা আবার বিয়েও করল। অর্থাৎ একজন ট্রান্সজেন্ডার নারী এবং আরেকজন ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ হিসেবে এমন দৃষ্টান্তও তৈরী হয়েছে। ইকুয়েডরে নারী-পুরুষ পার্টনার নিজেদের অদল-বদল করে ফেলে (Diane and Fernando)। ২০১৬ সালে 'বাবা' সন্তান জন্ম দিয়েছে বলে লিবারেল মিডিয়া (বিবিসি, গার্ডিয়ান) ইতিবাচক প্রতিবেদন করে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশটিতে এলজিবিটি অধিকার যে বাস্তবায়ন হয়েছে এই ঘটনাটি হলো তার একটি দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে রক্ষণশীল মিডিয়া এটি নিয়ে প্রশ্ন তোলে পুরুষ কিভাবে সন্তান জন্ম দিতে পারে ।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম ট্রান্সজেন্ডার বাবা-মা! 'Father' is pregnant by the 'mother' 'বাবা' গর্ভবতী এবং 'মা' সন্তান ধারণে সহায়তাকারী। যিনি নিজেকে পুরুষ দাবী করছেন তিনি জন্মগত মেয়ে (সন্তান ধারণে জরায়ু আছে), আর যিনি নিজেকে মেয়ে বলছেন তিনি জন্মগত পুরুষ (সন্তান ধারণে শুক্রানু দিতে পারেন)। মোদ্দা কথা- ফ্যান্টাসিতে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের বাহ্যিক চেহারা অদল-বদল করেছেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে- আমেরিকায় সমলিঙ্গের বিয়ের বৈধ হওয়ার আগে (২০১৪) ট্রান্সজেন্ডার নারী টেকনিক্যালি জৈবিক ও জন্মগত পুরুষকে আইনত বিয়ে করতে পারেনি। কারণ ট্রান্সজেন্ডার নারীকে পুরুষ হিসেবেই ধরা হতো। ১৯৯৬ সালে Littleton v. Prange কেইসের ক্ষেত্রে সমলিঙ্গের বিয়ে হিসেবে পরিগণিত হবে বিধায় আদালত তা অবৈধ ঘোষণা করে। ইংল্যান্ডেও এমন উদাহরণ রয়েছে ।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ উত্থানের ইতিহাসের

ট্রান্সজেন্ডার শব্দটা মোটামুটি নতুন। আজকাল যেটাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হচ্ছে আগে সেটার নাম ছিল ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ (Transsexual)। নানান ঘটনা প্রবাহ আর তত্ত্বের মিশেলে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ ট্রান্সজেন্ডার হয়ে উঠতে শুরু করে সত্তরের দশকের শেষ দিক থেকে। ট্রান্সজেন্ডারবাদের বংশগতি বুঝতে হলে তাই আমাদের শুরু করতে হবে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদের ইতিহাস দিয়ে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শেকড় সেই জার্মানির বার্লিনে, জন্ম হয়েছিল কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের চিন্তা এবং ম্যাগনাস হার্শফিল্ডের অ্যাক্টিভসমের মাধ্যমে। মেডিকেল তত্ত্ব 8 পরিচিত ছিলো। সমকামী আন্দোলনের মতো ট্রান্সজেন্ডারবাদ উত্থানের নিয়মতান্ত্রিক নয়। সমকামী আন্দোলনের সিস্টেম্যাটিক ইতিহাস প্রায় ১৫০ বছরের (১৮৬০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত)। অন্যদিকে ১৯৫০ দশকে হ্যারি বেনজামিনের হাত ধরে ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ আমেরিকায় আমদানী হলেও সেটা চিকিৎসার গন্ডিতে আবদ্ধ ছিল।

১৯৬৯ সালে নিউ ইয়ার্কের স্টোনওয়ালের তথাকথিত দাঙ্গা শুরু করেছিল 'ড্রাগ কুইন' বা নারী সাজা পুরুষরা। তাদেরকে সমকামী আন্দোলনের অংশ মনে করা হতো। ট্রান্সজেন্ডার পরিচয়ের (জেন্ডার আইডেন্টিটি) ভিত্তিতে স্বতন্ত্র আন্দোলন হিসেবে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে।

সমকামী (LGB) আন্দোলনের মতো ট্রান্সজেন্ডার (T) আন্দোলন সামাজিকভাবে তেমনটা দৃশ্যমান ছিল না। তারা নীরবে নিভৃতে কাজ করার নীতি গ্রহন করে। ষাটের দশক থেকে লিঙ্গ সার্জারী এবং হরমোন চিকিৎসা বৈধ ছিল। লিঙ্গান্তর করার পর বিভিন্ন আইনত জটিলতা শুরু হয়-নতুন পরিচয়পত্র থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার, পাবলিক টয়লেট, নারী হোস্টেল সিট, জেলখানায় কয়েদীর থাকার জায়গা, নারীদের খেলাধুলা ইত্যাদি। তাই সঙ্গত কারণে শুরুতে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টদের মূল ফোকাস ছিল আইন সংস্কার নিয়ে।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ড: সমকামী আন্দোলনের জনক

বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্লিনে আস্তানা গেড়েছিল ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। শুরু করেছিল বিকৃতির সামাজিকীকরণের নানা উদ্যোগ। সমকামী আন্দোলনের জনক বলে পরিচিত ইতিহাসের এই বিচিত্র চরিত্রকে ট্রান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের গল্পেও এক কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যায় তাকে।

সমকামী আন্দোলন নিয়ে কাজ করার সুবাদে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্তদের মধ্যে বিশেষ এক শ্রেণিকে চিহ্নিত করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ড। এ ধরনের মানুষ বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে পছন্দ করে, এর মধ্যে যৌন আনন্দ খুঁজে পায়। এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশের মধ্যে উভকামিতা, অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে যৌন সম্পর্কের প্রবণতা দেখা যায়। এ জাতের লোকেদের বর্ননা দিতে গিয়ে ১৯১০ সালে নতুন একটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফেল্ড-**ট্র্যান্সভেস্টাইট (Transvestite)** বেশ কয়েক দশক পর অ্যামেরিকাতে যখন এ ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবে, তখন জনপ্রিয়তা হয়ে উঠবে 'ক্রসড্রেসিং' আর 'ড্রাগ'-এর মতো কিছু শব্দ। শব্দগুলো আলাদা হলেও মূল অর্থ এক। এমন কেউ, যে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। নারী সাজা পুরুষ অথবা পুরুষ সাজা নারী।
১৯২৩ সালে আরেকটা শব্দ উদ্ভাবন করে হার্শফেল্ড, **ট্র্যান্সসেক্সুয়াল (Transsexual)**। এমন মানুষ, যারা চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের শরীরকে বিপরীত লিঙ্গের মতো করতে চায় স্থায়ীভাবে। সোজা বাংলায়, ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হলো ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে বিশেষ একটা শ্রেণি, যারা 'লিঙ্গ পরিবর্তন' করতে চায়।

কার্ল হাইনরিখ উলরিখসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ম্যাগনাস হার্শফেল্ডও মনে করত, সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত মানুষরা নারী ও পুরুষের বাইরে তৃতীয় একটা শ্রেণি। পুরুষের দেহে 'আটকা পড়া নারী'। এ তত্ত্বে হার্শফেল্ড কিছু পরিবর্তন আনলেও, মোটাদাগে সেটা উলরিখসের তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বেরই একটা সংস্করণ হিসেবে থেকে যায়। এই তত্ত্ব ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থানে বড় একটা ভূমিকা রাখে। তৃতীয় লিঙ্গ তত্ত্বের আলোকেই তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারির যৌক্তিক ভিত্তি তৈরি করে হার্শফেল্ড। উলরিখস ও হার্শফেল্ডের চিন্তা থেকে আসা যুক্তির সিঁড়িটা অনেকটা এরকম—

- সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত পুরুষরা আসলে পুরুষ দেহে আটকা পড়া নারী সত্তা।
- সমকামী পুরুষদের অনেকে নিজেদের নারী হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। নারীর পোশাক পরে, তাদের আচরণ অনুকরণ করে।
- এই চাওয়া যদি যথেষ্ট তীব্র হয়, তাহলে 'চিকিৎসা হিসেবে' অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এসব পুরুষের দেহকে নারীদেহের মতো করে দেওয়া যেতে পারে।
- এতে করে তাদের ভেতরের নারী সত্তার সাথে বাইরের দেহটা মিলবে।

এসব তত্ত্ব ও ধারণার আলোকে ১৯২০-এর দশক থেকে তথাকথিত 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করে হার্শফেল্ড। এক্ষেত্রে কাজে লাগায় তার গড়ে তোলা 'যৌন গবেষণা ইনস্টিটিউট'-কে। হার্শফেল্ডের তত্ত্বাবধানেই ১৯২২ সালে পৃথিবীর প্রথম 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি হয়। রোগী, রুডলফ রিকটার নামে একজন পুরুষ। সার্জারির পাশাপাশি রিকটারকে হরমোন 'চিকিৎসা' দেওয়া হয়।

হ্যারি বেঞ্জামিন

হ্যারি বেঞ্জামিনের জন্ম বার্লিনে, ১৮৮৫ সালে। এখানেই তার বেড়ে ওঠা আর পড়াশোনা। এক পর্যায়ে সে স্থায়ীভাবে অ্যামেরিকা চলে যায়। মেডিসিনের ওপর পিএইচডি করলেও, যৌনতা সংক্রান্ত গবেষণা নিয়ে ভালোই আগ্রহ ছিল হ্যারি বেঞ্জামিনের। জার্মানিতে থাকা অবস্থায় সে হার্শফেল্ডের ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিল। অর্থাৎ, হার্শফেল্ডের তত্ত্ব, কাজ আর গবেষণার সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিল হ্যারি বেঞ্জামিন।

উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসির মতো চরিত্রদের সাথে বেঞ্জামিনের একটা পার্থক্য আছে। তারা নিজেরা বিকৃতিতে আসক্ত ছিল, তাই বিকৃতিকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কাজ করেছিলো। তবে হ্যারি বেঞ্জামিনের এ ধরনের কোন সমস্যা ছিলোনা। তবে তার একটা দুর্বলতা ছিলো যেকোন মুল্যে টাকা কামানো। সম্ভবত এই লোভ ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে তার কাজ কে প্রভাবিত করেছিলো।

ম্যাগনাস হার্শফেল্ডের ধারণাগুলোকেই নিজের মতো করে উপস্থাপন করে বেঞ্জামিন। সেও বলে-ট্র্যান্সসেক্সুয়াল হলো এমন মানুষ, যে বিপরীত লিঙ্গের মতো সাজতে চায়। এ চাওয়া অনেকের ক্ষেত্রে এতটাই তীব্র আকার ধারণা করে যে, তারা নিজেদের দেহকেও বদলে ফেলতে চায়। তারা নাকি 'তাদের পুরুষ দেহের ভেতর নারীসত্তা ধারণ করে'। এই প্রবণতা পুরুষদের মধ্যে বেশি। বেঞ্জামিনের ভাষায়, 'ট্র্যান্সসেক্সুয়ালরা হলো পুরুষ ট্র্যান্সভেস্টাইটদের মধ্যে সবচেয়ে অসুস্থ দল'। এ ধরনের লোকেদের ক্ষেত্রে মানসিক চিকিৎসায় কাজ হয় না। এসব রোগীদের একমাত্র চিকিৎসা হলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন'।

বেঞ্জামিন এবং তার সহকর্মী চার্লস ইহলেনফেল্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করে,
'পুরুষের শরীরে আটকা পড়া নারীর মন' বা 'নারীর শরীরে আটকা পড়া পুরুষের মন' থেকে যে দ্বন্দ জন্ম নেয়, সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব।

লেখালেখির পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকে রোগীও দেখে বেঞ্জামিন, এবং তাদের 'লিঙ্গ পরিবর্তনের' পরামর্শ দেয়।। অ্যামেরিকাতে সার্জারির সুযোগ না থাকায় অপারেশনের জন্য সে তার রোগীদের পাঠায় ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা, ইস্তাম্বুল, ডেনমার্ক কিংবা সুইটযারল্যান্ডের মতো জায়গায়। এমনই এক রোগী জর্জ জর্গেনসেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর হয়ে যুদ্ধ করা জর্জ ১৯৫২ সালে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করায় ডেনমার্কে। নতুন নাম নেয় ক্রিস্টিন জর্গেনসেন। নিজের 'রূপান্তর' এর খবর গোপন রাখার চেষ্টা করলেও, কীভাবে কীভাবে যেন পত্রিকাওয়ালাদের কাছে তা পৌঁছে যায়। 'লিঙ্গ পরিবর্তন'-এর ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানতে শুরু করে। মেডিক্যাল ফিল্ডেও বেড়ে যায় ট্র্যানসেক্সয়ালিসম নিয়ে লেখালেখি। গতিশীল হয় হ্যারি বেঞ্জামিনের গবেষণা এবং প্রচারণা।

এবার বেঞ্জামিন মনোযোগী হয় অ্যামেরিকাতে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি চালু করার দিকে। ১৯৬৪ সালে নিজের নামে ফাউন্ডেশন খোলে সে। দু বছর পর, ৬৬ তে প্রকাশিত হয় তার লেখা বই, 'দা ট্রান্সসেক্সুয়াল ফেনোমেনন'। মজার ব্যাপার হলো, সে বছরেই তার উদ্যোগে চালু হয় অ্যামেরিকার প্রথম জেন্ডার ক্লিনিক। যে রোগকে বেঞ্জামিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল, তার কথিত সমাধান নিয়ে হাজির হয় সে নিজে।

এরিকসন ফাউন্ডেশন:

ট্রান্সসেক্সুয়ালবাদ প্রসারের পেছনে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি ছিলো এরিকসন ফাউন্ডেশন।

১৯৬৩ সালে লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারির জন্য বেঞ্জামিনের কাছে হাজির হয় রিটা এরিকসন। সে ছিলো সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত।

বেঞ্জামিনের সহায়তায় ১৯৬৫ সালে অপারেশন করে পুরুষ হলো রিটা এরিকসন, নতুন নাম রীড এরিকসন।

এরিকসন তারপর এমন একটা কাজ করলো, যা পরে সদূরপ্রসারী প্রভাব রাখবে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্ব এবং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থান ও প্রসারে। হ্যারি বেঞ্জামিনের সাথে পরিচয়ের এক বছরের মাথায় ১৯৬৪ সালে নিজ নামে একটা ফাউন্ডেশন খুললো সে—এরিকসন এডুকেশন ফাউন্ডেশন। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে কয়েক লক্ষ ডলারের অনুদান দিলো বেঞ্জামিনকে। এরিকসনের টাকা দিয়েই চালু হলো হ্যারি বেঞ্জামিনের ফাউন্ডেশন। তারপর

এরিকসন মনোযোগ দিলো 'লিঙ্গ পরিবর্তন' তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ষাট ও সত্তরের দশকে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে যত কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবকিছুর পেছনে রিটা এরিকসনের চেকবই আর এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।

কথিত লিঙ্গ পরিবর্তনের তত্ত্বকে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এরিকসন ফাউন্ডেশনের ভূমিকাকে মোটাদাগে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। সামাজিকীকরণ: ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রতি মেডিক্যাল ফিল্ড এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বেশ কিছু কাজ করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন,

- 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে প্রতি বছর মেডিক্যাল সিম্পোসিয়ামের আয়োজন করা ও খরচ যোগানো। ফাউন্ডেশনের খরচে বাছাই করা ডাক্তার ও মনোবিদদের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হতো। সেখানে গিয়ে তারা ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে লেকচার দিতো। 'বাছাই করা' ডাক্তার ও মনোবিদদের মধ্যে ছিল জন মানির মতো লোকজন। মানি এই ফাউন্ডেশনের বোর্ডের সদস্যও ছিল।
- মেডিকাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার মিটিংয়ে 'লিঙ্গ পরিবর্তন' নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- শর্টফিল্ম, পুস্তিকা আর লিফলেটের মাধ্যমে ডাক্তার, মনোবিদ, উকিল, পুলিশ, পাদ্রী এবং সামাজিক কর্মীদের মধ্যে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে সচেতনতা তৈরি।

২। অনুদান : ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ নিয়ে গবেষণা এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন' ক্লিনিক স্থাপনের জন্য উদার হস্তে টাকা ঢেলেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন। একটু আগে জনস হপকিন্সের যে ক্লিনিকের কথা বললাম, সেটার পেছনেও ছিল এরিকসনের টাকা। অনুদানের সব টাকা যেত বেঞ্জামিন ফাউন্ডেশনের হাত ঘুরে।

৩। 'রোগী' সেবা: লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সহজ করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয় এরিকসন ফাউন্ডেশন। যেমন:

- সহজে অপারেশন করতে রাজি হয় এমন ২৫০ জনের বেশি ডাক্তারের লিস্ট তৈরি করেছিল এরিকসন ফাউন্ডেশন।

-
- ইন্সুরেন্স কোম্পানি, নগর ও প্রাদেশিক কল্যাণ সংস্থা, এমনকি কারিগরি শিক্ষা ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করা নানা প্রতিষ্ঠানকেও লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশনের অর্থায়ন করতে রাজি করায় এরিকসন ফাউন্ডেশন।
- সার্জারি করেনি এমন পুরুষদের নারী সেজে ঘুরে বেড়ানোর অনুমতিপত্র দিতেও পেনসিলভেনিয়া রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগকে রাজি করায় এই ফাউন্ডেশন।
- সার্জারি করা লোকেদের নতুন জন্ম সনদ দেওয়ার জন্য অ্যামেরিকা জুড়ে রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের লোকদের পেছনে লবিয়িং করে এরিকসন ফাউন্ডেশন।

এভাবে লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে মেডিক্যাল ফিল্ড ও প্রশাসনের মনোভাব ও চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এরিকসন ফাউন্ডেশন। তৈরি করে আইনি বৈধতার ভিত্তি, গড়ে তোলে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক।

হার্শফেল্ডের মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পরে মুন্সিয়ানার সাথে তার কৌশলগুলো কাজে লাগায় এরিকসন ফাউন্ডেশন। আবার আশির দশকের শেষ দিকে এই একই কৌশলগুলো গ্রহণ করে সমকামী অধিকার আন্দোলন। পায় ব্যাপক সাফল্য। আর এই কৌশলগুলোরই মাধ্যমে, ডাক্তার-তাত্ত্বিক-দাতা এবং রোগীর যোগসাজসকে কাজে লাগিয়ে, নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দুই দশকে সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে যায় ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ।
(তথ্য সুত্র: অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান; পৃ:১৩৬-১৪৩)

জন মানি: জেন্ডার তত্ত্বের জনক

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের উত্থান এবং বিবর্তনের পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা মানুষগুলোর অন্যতম হলো ড. জন মানি। হ্যারি বেঞ্জামিনের তৈরি করা গবেষণা টিমের অন্যতম এই সদস্য ছিল এরিকসন ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বারও। ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে নানা দেশে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের তত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতো সে। তার উদ্যোগেই চালু হয়েছিল জনস হপকিন্সের লিঙ্গ পরিবর্তন ক্লিনিক। চিকিৎসাক্ষেত্রে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের স্বাভাবিকীকরণে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের তালিকা করা হলে হ্যারি বেঞ্জামিনের ঠিক পরেই আসবে তার নাম।

তবে জন মানির সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী এবং বিধ্বংসী অবদান হলো তার 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকার' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব থেকে জন্ম নেয় জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদ, যার প্রভাবে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ একসময় পরিণত হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে। বিকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে মানির ভূমিকার তুলনা চলে কেবল অ্যালফ্রেড কিনসির সাথে। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ কী করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হয়ে উঠলো, তা বুঝতে হলে ব্যক্তি জন মানির পাশাপাশি আমাদের পরিচিত হতে হবে তার চিন্তা ও কাজের সাথে।

জেন্ডার তত্ত্ব

হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করার পর জন মানি চাকরিজীবন শুরু করে জনস হপকিন্সে। শিক্ষক হিসেবে। তার পিএইচডি ছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে, এবং এ নিয়েই জনস হপকিন্সে কাজ করছিল সে। গবেষণার অংশ হিসেবে ১৯৫৫ সালে 'জেন্ডার রোল' বা 'লিঙ্গ ভূমিকা' নামে একটি ধারণা প্রস্তাব করে মানি। সেই তত্ত্ব নিয়ে কথা বলার আগে জেন্ডার শব্দের ইতিহাসটা এক নজর দেখে নেওয়া দরকার।

ইংরেজি ভাষায় জেন্ডার (gender) শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় চতুর্দশ শতাব্দীতে, ব্যাকরণের আলোচনায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে জেন্ডার শব্দটার ব্যবহার পাওয়া যায় ১৯৪৫ সালে। ম্যাডিসন বেন্টলি নামে একজন মনোবিদ এই শব্দ ব্যবহার করে নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্যের সামাজিক দিককে বোঝাতে । তবে শব্দটাকে সত্যিকার অর্থে পরিচিত করে তোলে জন মানি। ১৯৫৫ সালে এক অ্যাকাডেমিক পেপারে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে আলোচনাতে প্রথমবারের মতো 'জেন্ডার রোল' (Gender role) পরিভাষা প্রস্তাব করে সে। জেন্ডার শব্দটাকে সে প্রয়োগ করে নতুন এক পারিভাষিক অর্থে।

জন্মগতভাবে আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের যৌনাঙ্গের বিকাশজনিত নানা ত্রুটি থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে থাকে অপূর্ণাঙ্গতা। মানির মতে, এ ধরনের শিশুদের প্রধান চিকিৎসা অপারেশন। এতটুকু পর্যন্ত মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গণ্ডগোল বাঁধলো যখন নিজের প্রস্তাবনার পক্ষে নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করলো সে। মানি বললো, জন্মের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুরা কাঁদামাটির মতো থাকে। এসময় যেকোনোভাবে তাদের গড়ে নেওয়া যায়। শরীর যাই হোক না কেন, সময়মতো অপারেশন করা হলে যেকোনো শিশুকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে বড় করা সম্ভব।

ধরুন, কোনো ছেলেশিশুর জন্ম হয়েছে অপূর্ণাঙ্গ পুরুষাঙ্গ নিয়ে। তার দেহের ভেতরের প্রজনন ব্যবস্থা পুরুষের। মানির তত্ত্ব অনুযায়ী, জন্মের আঠারো মাসের মধ্যে যদি অপারেশন করে

পুরুষাঙ্গ ফেলে দেওয়া হয়, তারপর বাবা-মা যদি তাকে মেয়ে হিসেবে বড় করে, তাহলে এই শিশু একজন সুস্থ স্বাভাবিক নারী হিসেবে বেড়ে উঠবে।

এখানেই জেন্ডার রোলের ধারণা নিয়ে আসলো মানি। বললো, শরীর আর জেন্ডার রোল, দুটো আলাদা জিনিস। শরীর হলো জন্মগত। আর জেন্ডার রোল হলো, 'নারী বা পুরুষ হবার সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্য'।মানি আরও বললো, শিশু নিজেকে কোন পরিচয়ে চিহ্নিত করবে তা প্রায় পুরোপুরিভাবে নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিকতার ওপর; দেহের ওপর না। যেহেতু জন্মের আঠারো মাসের মধ্যেই পারিবারিকভাবে তাকে নারী হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলা হচ্ছে এবং তার শরীর থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে পুরুষত্বের চিহ্ন, তাই এই শিশু মানসিকভাবে একজন নারী হবে।

মানি তার জেন্ডার রোলের তত্ত্ব তৈরি করেছিল আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের নিয়ে গবেষণার আলোকে। তার নিজের ভাষ্যমতেই, 'জেন্ডারের এই নতুন অর্থের পেছনে অবদান রাখা অধিকাংশই ছিল হারমাফ্রোডাইট বা আন্তঃলিঙ্গ'।কিন্তু পুরো মানবজাতির ওপর সে এই তত্ত্ব চাপিয়ে দিলো। ঢালাওভাবে উপসংহার টেনে দিলো, মানুষের দেহ জন্মগত, কিন্তু তার জেন্ডার রোল সামাজিকভাবে নির্মিত। মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে উঠতে শিখে। আর এই শেখাটা নির্ভর করে তার পরিবেশের ওপর।

মানির এই তত্ত্ব দেহ আর পরিচয়কে পৃথক করে ফেললো। তার প্রচার করা জেন্ডার রোল-এর ধারণা লুফে নিয়ে জেন্ডার আইডেন্টিটি বা লিঙ্গ পরিচয় নামে আরেকটি ধারণা প্রস্তাব করলো ক্যালিফোর্নিয়া মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ড. রবার্ট স্টৌলার। স্টোলার বললো, জেন্ডার আইডেন্টিটি হলো নিজের পরিচয়ের ব্যাপারে একজন মানুষের অনুভূতি। এই অনুভূতি তার দেহের সাথে নাও মিলতে পারে। মানির মতো স্টোলারেরও প্রাথমিক গবেষণা ছিল আন্তঃলিঙ্গের মানুষদের নিয়ে।

আবারও মনে করিয়ে দিই, পুরো মানবজাতির ০.০১৮% হলো ইন্টারসেক্স। এই চরম সংখ্যালঘু মানুষদের নিয়ে বানানো অপ্রমাণিত মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বকে চাপিয়ে দেওয়া হলো পুরো মানবজাতির ওপর।

মানির চিন্তা দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে মনোবিদ্যা, চিকিৎসা এবং বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে। কিনসির মতোই মানির চিন্তা গভীরভাবে প্রভাবিত করে আধুনিক 'যৌনশিক্ষা'র কাঠামোকে। মানির তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয় শিক্ষাক্রম, সরকারি পলিসি, আইন, এমনকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি। কিনসির মতো জন মানিও এক অমোচনীয় কলংকের দাগ রেখে যায় আধুনিক মানসে।

সত্তরের দশকে নারীবাদী আন্দোলন দেহ থেকে আলাদা জেন্ডারের ধারণা গ্রহণ করে। জেন্ডার স্টাডিস নামে আলাদা শাস্ত্রই চালু করে ফেলে তারা। ১৯৮০ নাগাদ নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকার আলোচনাতে জেন্ডার শব্দটা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে এই শব্দের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের প্রচারকরাও। মানির 'জেন্ডার' তত্ত্ব পশ্চিমা জ্ঞানের জগৎ আর সংস্কৃতিকে এতটাই প্রভাবিত করে যে, এক সময় একে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

মানির তত্ত্বের মাধ্যমে ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদের ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে রূপান্তরিত হবার যাত্রা শুরু হয়। তবে বাকি রয়ে গিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু উপাদান। সেই উপাদানগুলো আসবে অপ্রত্যাশিত এক উৎস থেকে।

(তথ্য সূত্র: অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান; পৃ:১৭৫-১৮৫)

কুইয়ার তত্ত্ব : যেমন খুশি তেমন সাজো

কুইয়ার (queer) শব্দের অর্থ অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, অসুস্থ। এক সময় নেতিবাচক অর্থে কুইয়ার শব্দটা ব্যবহার হতো পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রে। আশির দশকের শেষ দিকে নারীবাদ, সমকামী আন্দোলন এবং উত্তর আধুনিক চিন্তার মিশেল থেকে এক বিচিত্র দর্শনের উদ্ভব ঘটে, প্রবক্তারা যার নাম দেয় কুইয়ার থিওরি বা কুইয়ার তত্ত্ব। এলজিবিটি আন্দোলনের নামের সাথে যে কিউ (Q) যুক্ত করা হয়, সেটা এসেছে কুইয়ার শব্দের আদ্যাক্ষর কিউ থেকে। যৌন বিপ্লব এবং নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাবে আশির দশকের শুরুর দিকে কিছু কিছু পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেন্ডার স্টাডিস নামে আলাদা একটা বিষয় পড়ানো শুরু হয়। বোভয়া আর ফায়ারস্টোনের মতো তাত্ত্বিকদের চিন্তার আলোকে যৌনতা এবং নারী-পুরুষের সামাজিক-পারিবারিক ভূমিকার ধারণাকে আক্রমণ করে জেন্ডার স্টাডিস।

জেন্ডার স্টাডিস আর পোস্টমডার্নিসমকে একসাথে করে সব ধরনের যৌন বিকৃতির তাত্ত্বিক বৈধতা দেওয়ার কাজটা করে কুইয়ার থিওরি। চ্যালেঞ্জ করে বসে জেন্ডার এবং যৌনতার ধারণাকেই। বলে, যৌনতা এবং জেন্ডার কোনোটাই স্থায়ী না। দুটোই সমাজের তৈরি, দুটোই পরিবর্তনশীল।

কুইয়ার থিওরির সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক জুডিথ বাটলার যেমন বলে, জেন্ডার হলো একটা পারফর্মেন্স। নাটকের অভিনেতারা যেমন বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে, তেমনি সমাজে মানুষ নারী বা পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজের প্রথা-প্রচলন আর প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্দিষ্ট

কিছু বেশভূষা, আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গি গ্রহণ করে মানুষ। নির্দিষ্ট ধরনের শরীরের মানুষের কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ প্রত্যাশা করে সমাজ। জেন্ডার গড়ে উঠে এই পোশাক, আচরণ আর ভঙ্গির মতো বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি এবং প্রকাশের মাধ্যমে। জেন্ডার সহজাত না, সামাজিকভাবে নির্মিত। নারী বা পুরুষের ভূমিকায় মানুষ অভিনয় করে।

জুডিথ বাটলারের তত্ত্ব নারী ও পুরুষের মৌলিক ধারণাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। তার মতে, দেহ জন্মগতভাবে নির্ধারিত, কিন্তু মানুষের নারী বা পুরুষ পরিচয় সহজাত এবং স্থায়ী কোনো সত্য না। 'নারী' ও 'পুরুষ'-এর ধারণার স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই, এটা আমাদেরই তৈরি। দেহ আর জেন্ডার আলাদা, তাই দেহ নারীর হলে তার লিঙ্গ পরিচয়বোধ বা জেন্ডার নারী হবে, দেহ পুরুষের হলে তার জেন্ডার পুরুষ হবে, এমন হওয়াটা জরুরি না। মানুষের জেন্ডার পরিচিতি (জেন্ডার আইডেন্টিটি) তার আচরণের মাধ্যমে তৈরি হয়। তাই আচরণ বদলানোর মাধ্যমে ভিন্ন পরিচয় তৈরি করা সম্ভব।

বাটলারের চিন্তা অনুযায়ী মানুষের পরিচয় অনেকটা 'যেমন খুশি তেমন সাজো' খেলার মতো, যেখানে মানুষ বিভিন্ন পোশাক এবং চরিত্র বেছে নিতে পারে ইচ্ছেমতো। একই অভিনেতা নানা ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, একই মানুষ গ্রহণ করতে পারে নানান জেন্ডারের ভূমিকা।

কুইয়ার থিওরির অন্যান্য তাত্ত্বিকরা এর সাথে যুক্ত করে বৈপ্লবিক আমেজ। তারা বলে, পুঁজিবাদী গোষ্ঠী যেভাবে সর্বহারাকে শোষণ করে, পুরুষ যেমন শোষণ করে নারীকে, ঠিক তেমনিভাবে 'স্বাভাবিক' যৌনতার কথা বলে 'অস্বাভাবিক' (বিকৃত) যৌনতায় লিপ্ত মানুষদের 'শোষণ' করে সমাজ। নারী ও পুরুষের 'গতানুগতিক ধারণা' ব্যবহার করে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া মানুষদের 'শোষণ' করা হয়। যৌনতাকে কেবল নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মাধ্যমে বৈষম্য করা হয় সমকামী, উভকামী, প্যানসেক্সুয়ালিজমসহ বিকল্প যৌনতায় আগ্রহী মানুষদের সাথে। যৌনতার ব্যাপারে ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ কিংবা নৈতিকতার ধারণাগুলো আসলে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক শোষণ ও নির্যাতনের ফসল।

শোষণের এই কাঠামো আর এই সব ধারণা ভেঙ্গে দিতে হবে। এই কাঠামো লঙ্ঘন একটা বৈপ্লবিক কাজ। সমকামিতা কেবল যৌন সুখের সন্ধান না, বরং ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। বহুগামী নারী হলো আধুনিক বিপ্লবী। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় বিপ্লব হলো নারীপুরুষের বিভেদ মুছে দেওয়া-ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। কারণ, এ মতবাদ সব প্রথা, প্রচলন আর কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে। পুরুষ যদি নারী হতে পারে, নারী যদি হতে পারে পুরুষ, তাহলে শোষণের এই পুরো কাঠামোই ধ্বসে পড়ে।

এভাবে কুইয়ার থিওরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করে। এ ধারার গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকদের একজন সুসান স্ট্রাইকারের মতে ট্র্যান্সজেন্ডার হওয়া হলো পরিবার, সামাজিক মূল্যবোধ, যৌনতার স্বাভাবিক কাঠামো এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ক্রোধ আর প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ।

নারীবাদী তত্ত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতার দর্শন আর পোস্টমডার্নিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে বিভিন্ন যৌন বিকৃতির বৈধতা ও স্বাভাবিকীকরণের অজুহাত তৈরি করে কুইয়ার তত্ত্ব। আর এ তত্ত্বের হাত ধরেই দীর্ঘ চড়াইউতরাইয়ের পথচলা শেষ করে ট্যান্সসেক্সুয়ালবাদ পরিণত হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে।

ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ কীভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ হয়ে উঠলো, তার দীর্ঘ এবং চমকপ্রদ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত একটা ছবি আমরা দেখলাম। বিকৃতকামী পুরুষদের ফ্যান্টাসি আর বাতিক হিসেবে, সময়ের পরিক্রমায় হয়ে উঠলো ব্যক্তি এবং পরিচয়ের ব্যাপারে জটিল কিন্তু প্রভাবশালী তত্ত্বে। বিবর্তনের এ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করলো মনোবিদ্যার অপ্রমাণ্য তত্ত্ব, নারীবাদী চিন্তা, উত্তরআধুনিকতাবাদের দর্শন এবং সমকামী আন্দোলনের নিরেট বিকৃত যৌনতা। ধাপে ধাপে তৈরি হলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বর্তমান এই চেহারা।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এতো প্রভাবশালী হয়ে উঠলো যেভাবে

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ কীভাবে তৈরি হলো, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা দেখলাম। কিন্ত কীভাবে আজকের পৃথিবীতে এতো শক্তিশালী অবস্থান পৌঁছলো-এর সাথে জড়িত আছে পাশ্চাত্যের দর্শন, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তি পরিচয় ও মানবাধিকারের ধারণাসহ আরোচ অনেক কিছু। তবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের উত্থানের পেছনে সরাসরি সম্পর্ক খুঁজতে গেলে নিচের তালিকা পাওয়া যাবে-

- পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন, বিশেষ করে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় ধারা (Third wave feminism), যা নারীত্ব ও পুরুষের ধারণাকে আক্রমণ করেছে।

- অ্যামেরিকাতে হওয়া 'সমকামী অধিকার আন্দোলন', যার মাধ্যমে সমকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনতা এবং 'সমকামী বিয়ে' আইনী বৈধতা পেয়েছে।
- ষাটের দশকে অ্যামেরিকায় ঘটা 'যৌন বিপ্লব', যা যৌনতার ব্যাপারে সব ধরনের মূল্যবোধ মুছে ফেলেছে।

- এ তিনের মিশ্রণে তৈরি হওয়া জেন্ডার আইডেন্টিটি (Gender Identity) মতবাদ।
- চিকিৎসাশাস্ত্র, চিকিৎসক ও ফার্মাসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রির একটি অংশ।
- সমকামিতা ও অন্যান্য বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করা দাতারা।

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড যারা

আধুনিক ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯০ দশকের শুরুতে। এই আন্দোলনের প্রধান স্থপতি হচ্ছেন দুজন আমেরিকান ট্রান্সজেন্ডার ফিলিস ফ্রাই (Philips Frye), মার্টিনি রুথব্লাট (Martine Rothblatt) এবং ব্রিটিশ ট্রান্সজেন্ডার স্টিফেন হুইটল (Stephen Whittle)। তিনজনই আইন বিশেষজ্ঞ। মাত্র দুই দশকের প্রচেষ্টায় পুরো সমকামী অধিকার তথা LGBTQ+ আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন। ট্রান্সজেন্ডারিজম বিশ্বায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং জো বাইডেন। এই আন্দোলনের নেপথ্যের বিষয়গুলো জানা থাকলে তাদের কৌশল সম্পর্কে সচেতন হওয়া যাবে।

ফিলিপ ফ্রাই ও রুথব্লাট এর ভুমিকা

মার্কিন সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট হিসেবে চাকরি করা ফিলিপ ফ্রাই ত্রিশ বছর বয়সে নিজেকে নারী ঘোষণা করে। নাম নেয় ফিলিস। লিঙ্গ পরিবর্তনের সাথে জড়িত বিভিন্ন আইনি সমস্যার সমাধান এবং সামগ্রিকভাবে ট্রান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯২ সালে International Conference on Transgender Law and Employment Policy (ICTLEP) নামের কনফারেন্স আয়োজন করে ফ্রাই। আইসিটিএলইপি'র উদ্যোগে তৈরি হয় 'ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ ট্রান্সজেন্ডার রাইটস' নামে খসড়া আইন। নামে 'আন্তর্জাতিক' হলেও আসলে এটা ছিল অ্যামেরিকার হাতেগোনা কিছু নারী সাজা পুরুষের উদ্যোগ। এই 'আন্তর্জাতিক বিলে' নানা ধরনের দাবি ছিল। যেমন,

- ব্যক্তি তার ইচ্ছেমতো পোশাক পরতে পারবে।
- কেউ লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলে তাকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না।

- ব্যক্তি নিজেকে যে লিঙ্গের বলে পরিচয় দেবে তাকে ঐ লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশাধিকার দিতে হবে, ঐ লিঙ্গের জন্য নির্ধারিত কাজে অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে।

অর্থাৎ নিজেকে নারী দাবি করলেই যেকোনো পুরুষ নারীদের টয়লেট, হোস্টেল, কমনরুম ব্যবহার করতে পারবে। সুযোগ নিতে পারবে চাকরি বা সংসদে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কোটার। চাইলে সে অংশ নেবে নারীদের খেলাধুলায়।

ফ্রাইয়ের পাশাপাশি আইসিটিএলইপি'র আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল মার্টিন রথব্লাট। বিলের প্রথম খসড়া তারই তৈরি করা। রহস্যময় এক চরিত্র এই রথব্লাট। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। নাসা এবং হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের সাথে কাজ করা এই লোক একাধারে উকিল, বায়োটেকনোলজি উদ্যোক্তা, মেডিক্যাল এথিকসের ওপর ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এবং অ্যাকটিভিস্ট। হিউম্যান জিনোম এবং মানবাধিকার নিয়ে তার উদ্যোগে তৈরি খসড়া ইউনেস্কোতে গৃহীত হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে জাতিসংঘের। ১৯৯৪ সালে মার্টিন রথব্লাট নিজেকে নারী ঘোষণা করে।

অ্যামেরিকানদের দেখে অনুপ্রাণিত হয় 'প্রেস ফর চেইঞ্জ' নামে ব্রিটেনের একটি ট্র্যান্সজেন্ডার সংগঠন। তাদের উদ্যোগে একই রকমের একটি খসড়া বিল তৈরি হয় ১৯৯৭ সালে। তাদের লবিয়িং-এর কল্যাণে লিঙ্গ পরিবর্তন সংক্রান্ত আইন মূল্যায়নের জন্য ১৯৯৯ সালে ব্রিটিশ সরকার Interdepartmental Group on Transsexual Rights তৈরি করে। এর উপদেষ্টা বানানো হয় 'প্রেস ফর চেইঞ্জের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্টিফেন হুইটলকে। হুইটল একজন লেসবিয়ান বা সমকামী নারী, যে অপারেশন করে নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিতে শুরু করে।

তখনো পর্যন্ত ট্র্যান্সজেন্ডার এবং ট্র্যান্সসেক্সুয়াল শব্দ দুটো সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অ্যামেরিকাতে রথব্লাট আর ফ্রাইদের প্রস্তাবিত খসড়াতে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' ব্যবহার করা হয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটেনের সরকার যখন আইন পুনঃবিবেচনা করছিল, তখন সেখানে ব্যবহার করা হয়েছিল 'ট্র্যান্সসেক্সুয়াল'।

২০০৪ সালে ব্রিটেনে 'জেন্ডার রেকগনিশন অ্যাক্ট' পাশ হয়ে যায়। এটি ছিল ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিসমের জন্য বড় একটা বিজয়। এ আইনে বলা হয়, অপারেশন না করেও যে কেউ সরকারি কাগজপত্রে নিজের পরিচয় বদলাতে পারবে। অপারেশন না করা পুরুষ নারী হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র বা লাইসেন্স নিতে পারবে। একইভাবে অপারেশন না করা নারী চাইলেই পুরুষ হিসেবে কাগজপত্র নিতে পারবে সরকারের কাছ থেকে। ব্রিটেনের এই আইন ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বৈধতার ক্ষেত্রে মাইলফলকে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্টরা মনোযোগী হয়ে উঠে নিজ নিজ দেশে একই রকমের আইন পাশ করাতে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ

তারপর ব্যাপারটা চলে যায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ২০০৬ সালের নভেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগাকার্টা নামের শহরে জড়ো হয় একদল অ্যাকটিভিস্ট, উকিল, মানবাধিকারকর্মী এবং 'বিশেষজ্ঞ'। আন্তর্জাতিকভাবে সমকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনকে কীভাবে বৈধতা দেওয়া যায়, তার নকশা তৈরি ছিল এনজিওদের উদ্যোগে আয়োজিত এ মিটিংয়ের উদ্দেশ্য।

নীতিমালায় SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) নামে একটি নতুন সংক্ষিপ্ত শব্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। Sexual Orientation দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সমকামিতা (গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল), আর Gender Identity দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ইচ্ছেমতো পরিচয় পরিবর্তন (ট্রান্সজেন্ডার)। ইয়োগ্যাকার্তা নীতিমালার কিছু প্রধান অবস্থান:

- পায়ুসংগম-বিরোধী আইন বাতিল করতে হবে।
- সমকামী যৌন সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, অর্থাৎ সমকামিতাকে বৈধতা দিতে হবে।
- জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সমকামীদের মেডিকেল চেকআপ ও বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে।
- সমলিঙ্গের বিয়েকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
- LGBTQ+ মতবাদ প্রচারে মিছিল, মিটিং ও বক্তব্যের মাধ্যমে জনপরিসরে প্রচারণার সুযোগ দিতে হবে।

ট্রান্সজেন্ডার বিস্ফোরণ

LGBTQ+ আন্দোলন বেগবান হওয়ার সাথে সাথে সমাজে নৈতিকতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ২০১৫ সালে আমেরিকাতে সমকামী বিয়ে বৈধতা পাওয়ার পর এনজিও, অ্যাক্টিভিস্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মিডিয়া, রাজনীতিবিদ, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যারা এতদিন ধরে গড়ে তোলা যে বিশাল নেটওয়ার্ক সমকামিতা (LGB) স্বাভাবিকীকরণে কাজ করছিল, তারা মনোনিবেশ করে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ প্রচার এবং প্রসারে। শিক্ষা, চিকিৎসা, করপোরেট, ব্যবসা, খেলাধূলা মিডিয়া-সব সেক্টরে পলিসি পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, সব জায়গা ঢুকে যায় ট্রান্সজেন্ডারবাদ, জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্ব, লিঙ্গ-বৈচিত্র্য মতবাদ। শুরু হলো ট্রান্সজেন্ডার বাথরুম বিতর্ক, যেখানে অবিশ্বাস্যভাবে জড়িয়ে গেল বিশ্বের বিখ্যাত জায়ান্ট

কর্পোরেট, টেক কোম্পানীগুলোও। বিনোদন ইন্ড্রাস্ট্রি হয়ে উঠল LGBTQ+-এর প্রচার এবং প্রসার কেন্দ্র।

আইনি বৈধতার পর সমকামী বান্ধব পলিসির ফলশ্রুতিতে LGBTQ+ পরিচয় গ্রহণ করা কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা হু হু করতে বাড়তে থাকে। ২০২৪ সালের জরীপ অনুযায়ী আমেরিকার জেনজি (Gen-Z) জেনারেশনের তরুণ-তরুণীদের এক তৃতীয়াংশ (৩০%) নিজেদেরকে LGBTQ+ পরিচয় দিচ্ছে । প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের ওপর এক জরীপে দেখা গেছে, আমেরিকার তরুণদের মধ্যে ২০২২ সালে প্রতি ১০০০ জনে ২৮ জন নিজেদের ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় দেয়, যেটি ২০১৪ সালে ছিল প্রতি ১০০০ জনে ৬ জন ।

মেডিকেল সেন্টারের ডেটা অনুসারে আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭ থেকে ২০২১ সালের ব্যবধানে শিশু-কিশোরদের মাঝে জেন্ডার ইতিবাচক চিকিৎসা সংখ্যা বেড়ে গেছে ৩ গুণের বেশী। ২০১৭ সালে চিকিৎসা প্রত্যাশী শিশুদের সংখ্যা ছিল ১৫,১৭২ এবং এটি বেড়ে ২০২১ সালে হয়েছে ৪২,১৬৭।

অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ২০২৩ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুসারে -

- ২০০০ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ১৬ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয়দানকারীদের সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
- ২০০০ সালে প্রতি ৭০,০০০ জনে ১ জন ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে নতুনভাবে সনাক্ত করা হয়
- ২০১৮ সালে বেড়ে প্রতি ১৩,০০০ জনে ১ জনে উন্নীত হয়।
- ২০০০ সালে প্রতি ১ লাখে ৪ জন থেকে বেড়ে তা ২০১৮ সালে প্রতি ১ লাখে ৭৮ জনে পৌঁছায় (১৬-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে)।

(তথ্য সুত্র: সমতার আড়ালে সমকামিতা; পৃ:১৭৭)

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা

'সমকামিতা যৌন বিকৃতি' থেকে 'সমকামী বিয়ে বৈধ'-এ অবস্থানে আসতে অ্যামেরিকার লেগেছে ছয় দশক। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এত সময় লাগছে না। কারণ, এরইমধ্যে সমকামিতাকে বৈধতা দেওয়ার কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। আমরা দেখেছি সমকামিতার প্রচার, প্রসার ও স্বাভাবিকীকরণের এই এজেন্ডা গ্লোবাল এবং বিশ্ব রাজনীতির

সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেই তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে এলজিবিটি এজেন্ডার পক্ষে যা কিছু করা হচ্ছে, সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই ইতিহাসকে আমরা চার পর্যায়ে ভাগ করতে পারি,

- প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য
- দ্বিতীয় পর্যায়: গবেষণা এবং যৌন অধিকার
- তৃতীয় পর্যায়: সমকামী অধিকার
- চতুর্থ পর্যায়: যৌন শিক্ষা এবং ট্র্যান্সজেন্ডার

এই চারটি পর্যায়ের প্রতিটিতে নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়-

বিদেশি কানেকশন: বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল:

- পশ্চিমা ফান্ডিং
- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক
- দেশীয় এনজিও

পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি: বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হলো ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তারা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে, সেগুলো আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না; কিন্তু দিনশেষে এগিয়ে যাওয়া যায় ধাপে ধাপে অনেকদূর।

মিডিয়া, সুশীল সমাজ, প্রগতিশীল: মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সেলিব্রিটি, তথাকথিত সুশীল সমাজ এবং প্রগতিশীলরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগী বা সমর্থক ভূমিকা পালন করে গেছে। বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিওজীবী, তাই বিরোধিতার কোনো ইচ্ছা থেকে থাকলেও ডলারের

গরমে তা উবে গেছে দ্রুত। তাছাড়া প্রগতিশীলরা বিশ্বাসগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোনো মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না। তাই এলজিবিটি আন্দোলনের বয়ানও তারা গ্রহণ করে নিয়েছে বিনা প্রশ্নে।

শব্দজাদু: সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে বাংলাদেশে কাজ করা কঠিন। তাই শুরু থেকে এখানে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিকার শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন:

- Sexual Health বা যৌন স্বাস্থ্য
- Gender Identity বা মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়
- Sexual Minorities বা যৌন সংখ্যালঘু
- Sexual Rights বা যৌন অধিকার
- Sexual Diversity বা যৌন বৈচিত্র্য
- Gender Diversity বা লিঙ্গ বৈচিত্র্য
- GDP (Gender Diverse Person) বা বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ
- CSE (Comprehensive Sexuality Education) যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা
- ট্র্যান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য এক। আর তা হলো, বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেওয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ।

প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে 'এইডস প্রতিরোধ'-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করে বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও। স্বাভাবিকভাবেই তখন (এবং এখনো) বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। এইডস নিয়ে কাজ করার অর্থ ছিল সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা।

দ্বিতীয় পর্যায়: 'স্বাস্থ্য সেবা' থেকে 'যৌন অধিকার'

প্রথম দশ বছর কাজ চলে 'এইডস প্রতিরোধ' আর 'যৌন স্বাস্থ্য সেবা'র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/২০০৭ এর দিকে। এ সময়টাতে সমকামীদের 'যৌন সংখ্যালঘু' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের 'অধিকার'-এর দাবি নিয়ে আলাপ তোলা হয়। উলরিখসের বানানো সেই পুরোনো কৌশল বাস্তবায়িত হতে শুরু করে বাংলাদেশে। গবেষক ড. আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো। [৪১০].

তৃতীয় পর্যায় : প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাকটিভিসম

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ আর ফোরামের মাধ্যমে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে বাংলাদেশে। ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি 'গে বাংলাদেশ' নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল বাংলাদেশে এ ধরনের প্রথম গ্রুপ। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সদস্য রেঙ্গু জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় পশ্চিমে কাটিয়েছিল।

বাংলাদেশের এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রতিটা ধাপেই বিদেশি কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেতফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ডের 'অনুপ্রেরণা' আসে ব্রিটেনে কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণের পর। আর সমকামী ই-গ্রুপগুলোর পথচলা শুরু হয় বিদেশফেরত রেঙ্গুর মাধ্যমে

চতুর্থ পর্যায় : ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও যৌন শিক্ষা

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। ২০১৫-এর পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতারা। সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ নানা দিক বিবেচনা করে দেশীয় এনজিও এবং সংগঠনগুলো ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে কাজে মনোযোগী হয়। আর এজন্য কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গের মতো শব্দগুলিকে।

(তথ্য সুত্র :'বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা?', আসিফ আদনান। https://chintaporadh.com/behind-the-curtain.)

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ

হিজড়া নিয়ে একটিভিসম

নেপালে এবং পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় হিজড়াদের। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশি ডোনার আর বৈশ্বিক এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে তাদের সাফল্য হিসেবে। ২০১৫-তে ঢাকায় ব্যাপক জাঁকজমকের সাথে 'হিজড়া প্রাইড' নামে মিছিল আয়োজন করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। আমরা এরই মধ্যে দেখেছি 'প্রাইড প্যারেড' বা 'প্রাইড মিছিলের' ধারণাটা সরাসরি অ্যামেরিকান সমকামী আন্দোলন থেকে আসা। এই মিছিলে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের। হিজড়াদের তারা সংজ্ঞায়িত করে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে।
অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী'। অর্থাৎ হিজড়া বলতে মানুষ ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বোঝায়। যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত, এর ওপর তাদের কোনো হাত নেই, তাই এ ধরনের মানুষের প্রতি সমাজের সহানুভূতি আছে। সরকারি স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হিসেবে'। যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।
অর্থাৎ হিজড়ার সংজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক আর বাংলাদেশের সমাজ ও সরকারের অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার: শব্দের রাজনীতি

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি। তারা মনে করেছিল, হিজড়াদের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু গন্ডগোল বাঁধলো যখন সরকারিভাবে হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হলো 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে। কারণ, এভাবে সংজ্ঞা দেওয়ার ফলে,

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারটা চলে আসলো। আর পরীক্ষা হলে স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা কিংবা অপারেশন ছাড়াই নারী সাজা পুরুষেরা ধরা পড়ে যাবে। এদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল, ধরা পড়বে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩-এর স্বীকৃতির ফলে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য তো অর্জিত হলোই না, উল্টো দেখা দিলো সমস্যা।

এ পরিস্থিতিতে তাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল,

- হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা অথবা
- হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাও যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পত্রপত্রিকাতে প্রায়ই পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেওয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর দেখা যায়। এ ধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেকের মধ্যে ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ হিজড়াদের জায়গা দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোনো হাত নেই এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।
কিন্তু কেউ যদি এখন বলে বসে—হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে—ঐ সহানুভূতিটুকু তখন আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামিতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, তারপর তারাই আবার সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধা চাইছে—এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানুভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। যার ফলাফল ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।
বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তাই বেছে নেয় দ্বিতীয় রাস্তা। জোর দিতে শুরু করে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের ওপর। এতে করে একদিকে হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করে 'ট্র্যান্সজেন্ডার'দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা যায়। অন্যদিকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনে ঢুকিয়ে দেওয়া গেলে তৈরি হয়ে যায় সমকামিতার বৈধতার পথ। কারণ, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি। এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টরা এসময় থেকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে সামনে আনতে শুরু করে। তারা আরও দুটি কাজ করে। তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' কথাটার বিরোধিতা শুরু করে। কারণ, তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়। কিন্তু তাদের দরকার মনে মনে 'মনে হওয়া'-র স্বীকৃতি। অন্যদিকে তারা বলতে শুরু করে, 'হিজড়া' কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি'।

এ কথা বলার মূল কারণ হলো, আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর অজুহাত তৈরি করা। তাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে গেছে, তোমরা ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে এত মাতামাতি করছো কেন? তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোনো জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি। আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণ না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও দিতে পারে তারা। তাদের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ। এই কারণে আইনের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা থাকা দরকার।'

আদতে মূল কারণ হলো, সুস্থ পুরুষের নারী পরিচয় দিয়ে এবং সুস্থ নারীর পুরুষ পরিচয় দিয়ে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার সামাজিক ও আইনি বৈধতা তৈরি। এই হলো হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের পেছনের রাজনীতি।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম

নতুন কৌশল নেবার পর থেকে গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি নেটওয়ার্ক বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন

বন্ধু সোশ্যালের উদ্যোগে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতায় আমেরিকার (ইউএসএইড) ফান্ডিং-এ ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত হয় ২০২১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে (বন্ধু সোশ্যালের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১)।

২০২২ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় আইন হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে –

বৈষম্য ও লাঞ্ছনার শিকার ট্র্যান্সজেন্ডারদের সুরক্ষা ও অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আইন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন' নামের আইনটি পাস হলে বৈষম্য থেকে অনেকটাই মুক্তি মিলবে ট্র্যান্সজেন্ডারদের।

উপপরিচালক রবিউল ইসলাম বলেন, 'ট্র্যান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য এই জনগোষ্ঠী ও সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আগামী মাসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত

হবে। বৈঠকে সবার মতামত নিয়ে একটি আইন তৈরি করে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর এটি সংসদে উপস্থাপন হবে। তারপর বাস্তবায়ন করা হবে।'
তিনি বলেন, 'আইনটি বাস্তবায়িত হলে এই কমিউনিটির মানুষগুলো আর সেবা নিতে বৈষম্যের শিকার হবে না। বিদেশ যেতে পাসপোর্ট নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হবে না। জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে জটিলতার নিরসন হবে। আইন দ্বারা তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।'
(সূত্র: ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা২৪, মার্চ ১০, https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people)

এখান থেকে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো স্পষ্টভাবে জানা যায়।

- প্রথম ধাপে, 'ট্র্যান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা'র জন্য আইনের খসড়া তৈরি হবে।
- দ্বিতীয় ধাপে, খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে।
- তৃতীয় ধাপে, আইন মন্ত্রণালয় আইন চূড়ান্ত করবে।
- চতুর্থ ধাপে, আইন সংসদে উত্থাপন করা হবে এবং সেখানে তা পাশ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ধাপ শেষ, আমরা এখন আছি তৃতীয় ধাপে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত 'ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে' শিরোনামের এক খবরে বলা হচ্ছে-
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি জানান এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনটির খসড়া তারা প্রস্তুত করেছে বলে দাবী করলেও আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করছে বন্ধু সোশ্যাল।

২০২৪ সালে জানুয়ারী মাসে আমেরিকার নির্বাচনী প্রচারণার সময় মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা এবং ফ্লোরিডার রাজ্যের গভর্নর রন ডিস্যান্টিস বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে আমেরিকার জনগণের দেয়া ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করছে। ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাত দিয়ে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন সেখানে বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার বাস্তবায়নের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ২০২১ সালের আদমশুমারিতে প্রথমবারের মতো তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া)-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত করা হয়েছে। ইউএসএইডের প্রতিবেদন, 'Final Perfromance Evaluation for Rights for Gender Diverse Populations (RGDP) Activity'-এ এই তথ্য ডকুমেন্টশন করা হয়েছে ।

৫ আগস্ট ২০২১ প্রকাশিত ইউএসএইড সেই প্রকল্পকে হাইলাইট করতে প্রকাশিত প্রতিবেদন 5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World-এ তৃতীয় লিঙ্গ এবং ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা খসড়া আইনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

বন্ধু সোশ্যাল ২০২২-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে (পৃ. ৯) বলা হয়েছে-
'সমাজসেবা অধিতফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধু সোশ্যালের সাথে কলাবোরেশন করে ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে।'

মোদ্দাকথা, বাংলাদেশের বন্ধু সোস্যাল এলজিবিটি বৈশ্বিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের কাজ করছে।

'সমতার' নামে LGBTQ+ নীলনকশা: সহযোগিতায় বন্ধু সোশ্যাল

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকার USAID। সমতা (Equity) প্রজেক্ট হচ্ছে USAID এর একটি পাঁচ বছরব্যাপী চলমান (২০২২-২০২৭) প্রজেক্ট যার বাস্তবায়নে রয়েছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (১)। এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে: Promoting Gender Diverse Population (GDP) tolerance towards building an inclusive society in Bangladesh. ওয়ার্ক প্ল্যানের ভূমিকাতেই বলা হয়েছে: Gender Diverse Populations (GDPs) herein after referred as LGBTQI+ community elsewhere in the world.... |

তার মানে, GDP বলতে LGBTQ-কে তথা সমকামী গোষ্ঠীকেই বুঝানো হচ্ছে। আর একথা এখন আর অজানা নয় যে, inclusive society বা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বলতে সেই সমাজকেই বোঝায়, যে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমকামীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে তথা সমকামী-বান্ধব সমাজ। কাজেই সোজা কথায় বলা যায় সমকামীদের প্রতি সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি সমকামী-বান্ধব সমাজ গড়ে তোলাই এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য।

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারের মতবাদ

সামাজিকভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্য চলমান নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং অবাধ যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। এখানে কাজ চলছে দুইটি ধারায়। একটি হলো সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের শিক্ষা। অন্যটি হলো যৌন শিক্ষার নামে অবাধ, বিকৃত যৌনতা এবং এলজিবিটি মতবাদের স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ের ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় 'শরীফার গল্প' শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেওয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'

এ গল্পে 'শরীফা' নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ। যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সে নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

'... আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার।'

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'... ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

'...এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানি করা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। উলরিখস, হার্শফেল্ড, দ্য বোভয়া, জন মানি, হ্যারি বেঞ্জামিন, শুলামিথ ফায়ারস্টোন, জুডিথ বাটলার আর জুলিয়া সেরানোদের চিন্তার জগাখিচুড়ি মিশেল। তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে 'ট্র্যান্সজেন্ডার' শব্দটা বাদ দেওয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য থেকে যায় একই।

২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে- 'আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...'। নতুন বইয়েও শোনানো হয়েছে সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প। ৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।

আগের অধ্যায়গুলোর আলোচনার আলোকে যে-কেউ বুঝবেন 'শরীফার গল্প' ট্র্যান্সজেন্ডার নামের বিকৃতি নিয়ে। বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। কিন্তু অজ্ঞতা অথবা অন্য কোনো অজানা কারণে অনেকেই এ গল্পের সাথে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু এখানে যদি খেয়াল করি, গল্পটিতে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শরীফ জন্মেছে একজন সুস্থ পুরুষ হিসেবে। শারীরিকভাবে সে ত্রুটিহীন। কিন্তু নিজেকে সে নারী 'মনে করে'। তারপর গল্প গেছে হিজড়া নিয়ে আলোচনায়। অথচ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থান অনুযায়ী হিজড়া হলো যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী মানুষ। হিজড়াদের সমস্যা শারীরিক ও জন্মগত।

অন্যদিকে শরীফ হিজড়া না। কাজেই এ গল্পকে কোনভাবেই হিজড়াদের সাথে মিলিয়ে ফেলা যায় না।

শিশুকিশোররা সহজে প্রভাবিত হয়, নতুন জিনিসের প্রতি তাদের থাকে সহজাত আগ্রহ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি কিশোরদের সামনে বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বয়ঃসন্ধিকালে এমনিতেই নানা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। তার উপর লিঙ্গ নিয়ে এমন বিভ্রান্ত ধারণায় মগজধোলাই কিশোর কিশোরীদের জীবন বিষিয়ে দেবে। জন্ম নেবে নানা ধরনের অসুখ ও অসঙ্গতি।

এখানে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বয়ানকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মূল বক্তব্য হলো - একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি নিজেকে নারী দাবি করে তাহলে সে নারী। আবার নারীদেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবি করে তাহলে সে পুরুষ।

পাঠ্যবইয়ে এই মতবাদ আসলো কীভাবে?

পাঠ্যবইয়ে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ ঢোকানোর পেছনে আছে এনজিও এবং এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। এ ব্যাপারে নিজেদের ভূমিকার কথা খোলাখুলি স্বীকার করেছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপার্সন এবং নির্বাহী পরিচালকের লেখায় বলা হচ্ছে,

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে দৃঢ় লবিয়িং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।'

একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে 'ক্লাস ৭এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে'।

শিক্ষাক্রমে এনজিওদের প্রভাবের বিষয়টি উঠে এসেছে দেশের সংবাদপত্রগুলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও। ২৫শে ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বাংলা ট্রিবিউনে.প্রকাশিত 'গোঁজামিলে তৈরি হচ্ছে নতুন কারিকুলাম'

প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে,

জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) নির্দেশিকাতেই নতুন শিক্ষাক্রম তৈরি করা হয়েছে... অভিযোগ রয়েছে, ১৫ সদস্যের ওই গ্রুপের ছয়জন সদস্যকে বাইপাস করে ইউনিসেফ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কারিকুলাম তৈরির কাজ হচ্ছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে মিডিয়া

বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে পুরোদমে কাজ করছে মিডিয়া। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে ইতিবাচকভাবে নানা ধরনের প্রতিবেদন নিয়মিত আসছে নিউজ মিডিয়াতে। গুগল এবং ইউটিউবে ট্র্যান্সজেন্ডার লিখে সার্চ দিয়ে যে কেউ এ কথা যাচাই করে দেখতে পারেন। নিউজ মিডিয়ার পাশাপাশি বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজে। আলোড়ন তৈরি করা।।

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোনো মানুষের মনে হতে পারে, হয়তো আমাদের সমাজে দিন দিন 'ট্র্যান্সজেন্ডার' মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাই তাদের এত ঘনঘন, এত জায়গাতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টা আসলে তা না। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে, যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা-এনজিও-অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ।

ব্র্যাকের গবেষকরা যেমন এলজিবিটি নিয়ে ইতিবাচক খবর প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল, ঠিক একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচকভাবে লিখলেই 'পুরস্কার' পাচ্ছে সাংবাদিকরা। এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু'র ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী, ৫৬ জন সাংবাদিককে 'মিডিয়া ফেলোশিপ' দিয়ে পুরস্কৃত করেছে তারা। এছাড়া একাধিক বেসরকারি টিভি চ্যানেলে 'ট্র্যান্স টক' নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরণের কাজ।বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের 'দক্ষ ওয়াচডগে' পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, দেশি মিডিয়া এলজিবিটি নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো আচরণ করছে। এই দাবির সাথে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রসারেএনজিও ও অ্যাক্টিভিস্ট

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন এনজিও ও অ্যাক্টিভিস্টরা। কিছুক্ষণ আগে আমরা যেই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কথা বললাম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওর অর্থায়নে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে দেশীয় এনজিওগুলো। একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে পুরো নেটওয়ার্কটা কীভাবে কাজ করে তা দেখে নেওয়া যাক।

সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের তালিকা করলে প্রথম তিনের মধ্যে নির্ঘাত একটা নাম পাবেন, আরকাস ফাউন্ডেশন (Arcus Foundation)। এই ফাউন্ডেশন তৈরি করেছে অ্যামেরিকান বিলিয়নেয়ার জন স্ট্রাইকার। স্ট্রাইকার নিজে একজন সমকামী।

২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া আরকাস ফাউন্ডেশনের অনুদানের পরিমাণ ৫৮.৪ মিলিয়ন ডলার। পরের ১২ বছরে সংখ্যাটা বেড়েছে আরো বহুগুণ। স্ট্রাইকারের সাথে অনেক দিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে আরেক সমকামী ধনকুবের টিম গিল। গিল, স্ট্রাইকার এবং তাদের ক্ষমতাবান বন্ধুরা মিলে এলজিটিবিকিউ এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থাকে সব মিলিয়ে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান দিয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ অনুদানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত এক নেটওয়ার্ক।

আরকাস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত বা তাদের কাছ থেকে অনুদান পাওয়া সংস্থার মধ্যে প্রথমেই আসবে ইলগা (ILGA)-এর নাম। ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে।

আবার বাংলাদেশে যারা সমকামিতা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসার কাজ করছে তাদেরকে নানাভাবে সহায়তা করছে এই আন্তর্জাতিক এনজিও। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে আছে বাংলাদেশীদেরও আনাগোনা।

অর্থাৎ নানান হাত ঘুরে স্ট্রাইকারদের দেওয়া অনুদানের ডলার আমাদের এ মাটিতেও সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদসহ নানা বিকৃতির প্রচার ও প্রসারে দেদারসে খরচ হচ্ছে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা দেশীয় এনজিওগুলোর সাইটে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সাথে সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলা আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন।

ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টরা পৌছে গেছে প্রধানমন্ত্রীর অফিসেও।

খুব শীঘ্রই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ সংসদেও পৌছে যাবে, আর তারপর রাষ্ট্রযন্ত্রের সুবাদে ঢুকে পড়বে ঘরে ঘরে, এমন আশঙ্কা এখন আর অমূলক মনে হবার কথা না।

LGBTQ+ মিডিয়া সেলিব্রেটি

কোভিডের পর থেকে (২০২১-২০২৩) প্রথম আলো এক ঝাঁক নির্বাচিত ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্টকে বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এই কাজের জন্য মানসুরা হোসাইন নামক এক সাংবাদিককে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রথম আলোর প্রায় সব প্রতিবেদন তার মাধ্যমে হয়েছে। পত্রিকা যাদেরকে সামনে এনেছে, তারা সবাই ট্রান্সজেন্ডার, কেউ হিজড়া ছিলেন না এবং এদের প্রায় সবাই কোনো-না-কোনভাবে বন্ধু সোশ্যাল, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আইসিডিডিআরবি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত। এদেরকে বিভিন্ন ধরনের ট্রেইনিং-এর মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে। হিজড়াদের সামাজিকভাবে অবহেলা, বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ পুশ করা হয়েছে। LGBTQ+ গোষ্ঠীর নিজেদের বানানো হিজড়া ডেফিনেশন (এটা লিঙ্গ পরিচয় নয়, এটা একটি সংস্কৃতি) অনুযায়ী ট্রান্সেজন্ডার সেলিব্রেটিরা কেউ হিজড়া নয়, কেননা তারা গুরুর অধীনে ঢেরায় থেকে রাস্তায় ভিক্ষা করে না।

সব মিলে ট্রান্সজেন্ডার সেলিব্রেটিদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ জনের বেশী হবে না। প্রথম আলোর আর্কাইভ এনালাইসিস করে এটি দেখা গেছে। একটা মজার দিক হচ্ছে, যাদেরকে বেশী হাইলাইট করা হয়েছে তাদের সবাইকে কোভিডের সময় মানবাধিকার কর্মী হিসেবে পত্রিকায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এমন তিন জন ট্রান্সজেন্ডার নারী সেলিব্রেটি নিয়ে পর্যালোচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি-

- জয়া সিকদার (পুরুষ নাম: জয় সরকার)
- তাসনুভা আনান শিশির (পুরুষ নাম: কামাল হোসেন)
- হোচিমিন ইসলাম (পুরুষ নাম: রোকন)

জয়া সিকদার: উত্থানের নেপথ্যে আইসিডিডিআরবি

এই নাম দিয়ে গুগল সার্চ করলে জয়া সিকদার নামটি সবার উপরে চলে আসে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম, গোলটেবিল মিটিং, টকশো, সরকারী মিটিং-সব জায়গায় জয়া সিকদারকে বিশেষজ্ঞ বা এক্টিভিস্ট হিসেবে প্রচার করা হয়। জয়া সিকদার পটুয়াখালি থেকে ১৬ বছর বয়সে ঢাকা এসে পুরুষ যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। শুধু তাই নয়, নারী যৌন কর্মী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যদিও তিনি একজন পুরুষাঙ্গ-ওয়ালা মানুষ। এ থেকে অনুধাবন করা যায়, জয়া সিকদারের কমিউনিকেশন ভালো। আন্তর্জাতিকভাবে তিনি

আইসিডিডিআর, বি গবেষক হিসেবেও পরিচিত । তিনি হিজড়া নেত্রীও ছিলেন কিন্তু এখন নিজেকে বলেন ট্রান্সজেন্ডার এক্টিভিস্ট।

জয়া সিকদার আইসিডিডিআর,বি-এর প্রজেক্টে যৌনকর্মীদের সাথে যোগাযোগ এবং নমুনা সংগ্রহে কাজ করেছেন। কিন্তু বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে আইসিডিডিআর, বি থেকে প্রকাশিত জার্নাল পেপারে জয়া সিকদারকে বানানো হয়েছে সিনিয়র অথার (লাস্ট অথার), যদিও তার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই!

তাসনুভা আনান শিশির এবং হোচিমিন তৈরীর নেপথ্যে

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করতে প্রথম আলো প্রকাশ্যে এবং ব্র্যাক নেপথ্যে থেকে এক্টিভিস্ট তৈরি করেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের একদিকে বৈষম্যের শিকার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে প্রশংসিত করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে তাসনুভা আনান শিশির ও হোচিমিনকে এমনভাবে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বিশেষভাবে হাইলাইট করা হয়েছে, যেন মনে হয় তারা করোনার মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এই প্রচারের ভিত্তিতে পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে বিশেষ ফেলোশিপের মাধ্যমে এমপিএইচ কোর্সে ভর্তি করায়, যদিও তাদের ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর মতো আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা ছিল না। LGBTQ+ গ্লোবাল এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্র্যাকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম নৈতিকতাও বিসর্জন দিয়েছে।

প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টার মাত্র বছর দুয়েকের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে বেশকিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে, অথচ তারা দেশের বা সমাজের জন্য তেমন কোনো অবদান রাখেনি, যার জন্য মিডিয়াতে এত গুরুত্ব পাওয়ার কথা। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের মতো গণমাধ্যমগুলো দেশের সমাজের মূল্যবোধের বিরোধী মতাদর্শ বাস্তবায়নে কতটা সক্রিয় এবং উৎসাহী।

পুরুষকে নারীদের হোস্টেল সিট বরাদ্দ: প্রথম আলো এবং ব্র্যাকের এক্টিভিজমের সাফল্য

তারা কতটুকু মরিয়া যে, পুরুষদের ট্রান্সজেন্ডারের নামে মহিলা হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে । যে সিট পেয়েছে সে ব্র্যাকে কর্মরত, ওর সাথে লবিং করেছে হোচিমিন যে ব্র্যাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রডাক্ট এবং সেই সাংবাদিক মানসুরা হোসাইন যিনি হিজড়াদের সহানুভূতির মোড়কে ট্রান্সজেন্ডারদের নিয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করছেন, ফলো-আপ করছেন। অবশেষে এক পুরুষকে নারীদের হোস্টেলে সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজধানীর নীলক্ষেতে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের (আগে নাম ছিল নীলক্ষেত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল) সুপার ছামিনা হাফিজ। তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে মিরপুরের নওয়াব ফয়জুন্নেছা কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটিরও সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছামিনা হাফিজ প্রথম আলোকে বলেন, 'এর আগে কোনো ট্রান্সজেন্ডার সরকারি হোস্টেলে সিটের জন্য আবেদন করেননি। জারা রহমান প্রথমবারের মতো আবেদন করেছেন। হোস্টেলে সিট পেতে হলে যেসব ক্রাইটেরিয়া (শর্ত) থাকা প্রয়োজন, তা ওনার আছে। ওনাকে একটি একক সিট দেওয়ার চিন্তাভাবনা চলছে, যাতে তিনি হোস্টেলে স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারেন।'

হোস্টেল সুপার আরও বলেন, সরকার ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। জারা রহমানকে সিট দিতে পেরে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও খুশি হয়েছেন। তিনি হোস্টেলে থাকার পর কোনো কোনো নারী এ নিয়ে আপত্তি তুলতে পারেন। তবে যাতে কোনো ঝামেলা না হয়, তা সার্বিকভাবে নজরদারি করা হবে। এ ছাড়া বর্তমানে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে।

LGBTQ+ সংক্রান্ত যেসব পলিসি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে

১. বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টে আবেদন ফর্মে সেক্স শব্দের পরিবর্তে জেন্ডার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে লিঙ্গ পরিচয় হিসেবে। আমাদের অসচেতনতার সুযোগে এত বড় পরিবর্তন করা হয়েছে যা অকল্পনীয়, অবিশ্বাস্য। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে 'দৈনিক সমকাল একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যা শঙ্কিত করার মতো বিষয়। পত্রিকাটি এই শিরোনামে- 'ট্রান্সজেন্ডার-তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষায় আলাদা আইন দরকার'-জানায়- 'ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের রাজনৈতিক বিষয়ক প্রথম সচিব কর স্টোটেন বলেন, বাংলাদেশ সরকার ট্রান্সজেন্ডার এবং তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্টে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ থেকে এগিয়ে আছে। এটা খুবই প্রশংসনীয়। নো পাসপোর্ট ভয়েস-এর ট্রান্সজেন্ডার অধিকারবিষয়ক শুভেচ্ছা দূত

হো চি মিন ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ থেকে এগিয়ে আছে'।

২. লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মোড়কে পাঠ্যক্রমে সমকামিতা মতবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা নিয়ে পরবর্তীতে ব্যাপক বিতর্ক তৈরী হয়। পশ্চিমা দাতা সংস্থার লবিং এর ফলে কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষার প্রাথমিক বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে যুক্ত করা হয়েছে।

৩. ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা সংসদে গৃহিত হওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন আছে।

৪. ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু অন্তর্ভুক্তকরণে ভোটার নিববন্ধন ফর্মে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ফর্মে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে

৬. ট্রান্সজেন্ডারদের চাকুরির সুযোগ তৈরী করতে ২০২২ সালে আয়কর মওকুব করার নীতি গ্রহণ করে। ট্রান্সজেন্ডারদের সামাজিকীকরণের উদ্যোগ হিসেবে সমকামী গ্রুপের লবিং-এর ফলে (হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মাঝে কনফিউশান ও বিভ্রান্তি তৈরী করে) কর্মক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার নিয়োগ দিলে ৫% আয়কর মওকুব করার সিদ্ধান্ত। কোনো কোম্পানি এই সুযোগ নিতে হলে বছরে কমপক্ষে ১০০ জন ট্রান্সজেন্ডার চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে

৭. জাতীয় কিশোর স্বাস্থ্য পরিকল্পনায় (The National Adolescent Health
Strategy ২০১৭-২০৩০) LGBTQ+ ইস্যুকে যুক্ত করা হয়েছে।
জাতিসংঘের LGBTQ+ প্রমোটকারী সংস্থা UNFPA, UNICEF এবং
WHO সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

৮. সরকারি মহিলা হোস্টেলে ট্রান্সজেন্ডার নারীকে (জন্মগত পুরুষ) সিট বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯. নারী হয়েও ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ হিসেবে রেলওয়েতে চাকুরিতে স্থলাভিষিক্ত করার কথা উঠে এসেছে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিবেদনে।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে বন্ধু সোশ্যাল (বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১ ও ২০২২ এর তথ্যানুসারে) এবং অন্যান্য সংস্থার লবিংয়ের ফলে ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা

- বৈষম্যবিরোধী আইনের ড্রাফটে ট্রান্সজেন্ডার শব্দ ঢোকানো হয়েছে
- সাইকোলজিক্যাল সোস্যাইটির পলিসিতে যৌন সংখ্যালঘু টার্ম অন্তর্ভুক্ত
- বাংলাদেশ ব্যাংকে ইনক্লুসিভ ফিনান্স কনসেপ্ট ঢুকিয়েছে
- বিনোদনে জয়জয়কার- সুন্দরী প্রতিযোগিতা, ট্রান্সটক নামে বন্ধু সোশ্যালের বিশেষ অনুষ্ঠান
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পলিসির মাধ্যমে LGBTQ+ বান্ধব ঘোষণা--ব্র্যাকের সব প্রতিষ্ঠান.

- গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে জেন্ডার ট্রেইনিং
- সব বড় ইয়ুথ প্লাটফর্ম দখলে নিয়েছে (জাগো ফাউন্ডেশন, ভলান্টিয়ার বাংলাদেশ)
- ট্রান্সজেন্ডার মাদ্রাসা-মসজিদ বিশ্ব ও লোকাল মিডিয়ায় স্বাভাবিকীকরণ
- LGBTQ+দের জন্য লিগ্যাল হেল্পলাইন তৈরি করেছে (বন্ধু সোশ্যাল)।
- সমকামী ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের 'মানবাধিকারের' ব্যাপারে পাঁচশোর বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে 'সংবেদশনশীল' করে তুলেছে বন্ধু।
- সিলেট হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৯০টি 'সংলাপ অনুষ্ঠান' হয়েছে, যেখানে মোট ১৬২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেছে। এসব সংলাপে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে 'ট্র্যান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের অন্তর্ভুক্তির' কথা বলা হয়েছে।
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ৭৪ জনের বেশি স্টাফকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে সবক দেয়া হয়েছে
- ট্র্যান্সজেন্ডারদের মূল ধারার চাকরির বাজারে সুযোগ দেয়ার জন্য চেইম্বার অফ কমার্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছে অ্যাডভোকেসি করেছে
- বাংলাদেশ মেডিকাল স্টুডেন্ট সোসাইটি (বিএমএসএস) এর সাথে মিলে তরুণ চিকিৎসকদের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে কাজ করেছে।
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে LGBTQ+ মতবাদের ধ্যানধারণার সবক দেয়া হচ্ছে
- নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা নিজেদের সমকামী যৌনতার কারণে যৌনাঙ্গ ও মলদ্বারের বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। এদের সহজে চিকিৎসা দেয়ার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন পরামর্শের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু।
- মেয়েদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় পুরুষ (ট্রান্সজেন্ডার) বিজয়ী
- প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ট্রান্সজেন্ডার স্কলারশীপ চালু করে ২০২১ সালে (৮০-১০০% স্কলারশীপ)-.

ট্রান্সজেন্ডারবাদ স্বাভাবিকীকরণের ভয়াবহতা

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে সমস্যা কী?

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মেনে নিলে সমস্যা কী?

আপনার এতে করে কী ক্ষতি হচ্ছে?

ক্ষতি আমার না, আমাদের। পুরো সমাজের।

মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার লঙ্ঘন

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, ট্র্যান্সজেন্ডার মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে চরম সীমালঙ্ঘন। এটি আল্লাহর সৃষ্টিতে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন আনা, সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতাসহ নানা বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিদ্রোহ। মুসলিম হিসেবে এ ধরনের চরম সীমালঙ্ঘন আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব না।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের সামাজিক ও আইনী সমস্যা

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ স্বাভাবিকীকরণের কিছু আইনী ও সামাজিক সমস্যা সহজেই চোখে পড়ে। নিজেকে পুরুষ দাবি করা নারী উত্তরাধিকার ভাগ পাবে

১। উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে তৈরী হবে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা-

বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়ায় নারী এবং পুরুষের পরিচয়কে জন্মগত না করে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, একজন পুরুষ নিজেকে নারী হিসেবে বিবেচনা করলে সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে নারী হিসেবে মেনে নেবে। এই ধারণাটি পশ্চিমা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশে প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। বাংলাদেশের খসড়া আইন (তৃতীয় চ্যাপ্টার-অধিকার সুরক্ষা-উত্তরাধিকার) অনুসারে- "ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি কর্তৃক অনুসৃত ধর্ম অনুসারে তাহার জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারণ হইবে। যথা- ক) ট্রান্সজেন্ডার ম্যানের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ পুরুষের অংশের অনুরূপ হইবে; খ) ট্রান্সজেন্ডার উইম্যানের জন্য উত্তরাধিকারের অংশ নারীর অংশের অনুরূপ হইবে"। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ হানাহানি, মারামারি, বিশৃঙ্খলা হয় সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে। দেশের প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় মূলনীতির আলোকে নির্ধারিত হয়েছে। আমাদের দেশের জন্য মত অত্যন্ত দুর্বল সামাজিক এবং আইনী ব্যবস্থায় এলজিবিটি সামাজিকীকরণে সুদূরপ্রসারী প্রভাব কত যে ভয়ংকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়কে উপেক্ষা করা হলে সামাজিক ভারসাম্য কার্যত ভেঙ্গে পড়বে।

২। নারীরা বৈষম্যের শিকার হবে- নারীরা যাতে বৈষ্যমের শিকার না হয় সেজন্য নারীদের জন্য জব সেক্টরে নির্দিষ্ট কোটা সিস্টেম রয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার নারীরা (অর্থাৎ জন্মতগত পুরুষ) সেই পজিশনগুলো দখল করবে। খেলাধুলায় ইতিমধ্যে নারীদের পুরুস্কারগুলো ট্রান্সজেন্ডাররা নারীরা দখল করছে যা নিয়ে বিশ্বে অনেক বিতর্ক হচ্ছে।

৩। নারীরা জেলখানায়, হোস্টেল, টয়লেটে যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঝুঁকিতে পড়বে
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ট্রান্সজেন্ডার নারী (অর্থাৎ জন্মগত পুরুষ) কোন হলে সিট পাবে? ক্যাডেট কলেজ, আর্মি ব্যারাকে কেউ ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিলে তার স্থান কোথাও হবে? তারা কোন টয়লেট ব্যবহার করবে? দিন দিন এই সমস্যাগুলো পশ্চিমা সমাজে প্রকট হয়ে উঠছে। ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে মেয়েদের টয়লেট-লকার রুম ব্যবহার করার প্রাইভেসি নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়েছে প্রকৃত মেয়েরা।

৪। জনস্বাস্থ্য সমস্যা আরো ভয়ানক হবে
সামাজিক বিপর্যয়ের অপেক্ষায়
এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে LGBTQ+ গোষ্ঠীর মানুষদের বিভিন্ন রোগ এবং অপরাধপ্রবণতার (মাদকাসক্ত, শিশু যৌন নির্যাতন) ঝুঁকি অনেক বেশি। এগুলো আগের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এইডস, মাংকি পক্স, হেপাটাইসি-বি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ইত্যাদি সংক্রমিত রোগ ছাড়াও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক বেশী। বাংলাদেশের প্রায় ১০-১২% মানুষ ডায়াবেটিস, ২০% হৃদরোগে ভুগছে যা মোকাবিলা করা অনেক কঠিন একটা ব্যাপার। সমকামিতা সামাজিকীকরণে এই অবস্থা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে দেশে সমকামী পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডার (তৃতীয় লিঙ্গ) জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের হার বাড়ছে ২)। ২০১৭ সালে পুরুষ সমকামীদের মধ্যে এইচআইভিতে আক্রান্ত হওয়ার হার ছিল শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ১ শতাংশ। একই সঙ্গে ট্রান্সজেন্ডারদের মধ্যে ২০১৭ সালে এইচআইভি আক্রান্তের হার ছিল শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ।
(References:National-Strategy-for-Adolescent-Health-2017-2030.pdf.SAMAKAL.)

সমকামী পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ: গবেষণা, সমকামী পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি সংক্রমণ। (সুত্র: https://tinyurl.com/5dym3txr.)

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অবধারিত ফলাফল হলো সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতা দেওয়া। মনে করুন, একজন পুরুষ নিজেকে নারী বলে দাবি করা শুরু করলো। আইন তাকে নারী বলে মেনে নিলো। এখন বিয়ে কিংবা যৌনচাহিদা মেটাতে গিয়ে সে কী করবে? সে যদি কোনো পুরুষকে বেছে নেয়, তাহলে সেটা হবে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা। কারণ সে যদিও নিজেকে নারী দাবি করছে, কিন্তু আসলে সে একজন পুরুষ সে যাকে বেছে নিয়েছে সেও পুরুষ। কাজেই এটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা। যদিও 'দূর থেকে' তাদের স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয়।

অন্যদিকে সে যদি কোনো নারীকে বেছে নেয়, তাহলে কার্যত সেটা সমলিঙ্গের মধ্যে যৌনতা হবে না। কিন্তু আপাতভাবে, সমাজের চোখে, যারা বিস্তারিত জানবে না তাদের কাছে একে মনে হবে সমকামিতা। কারণ সে নিজেকে নারী হিসেবে উপস্থাপন করে একজন নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক করছে।
অর্থাৎ যা-ই বেছে নেওয়া হোক না কেন, দিন শেষে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ ঘটবে।

অসুস্থতা ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার আবদার জানায়। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নিতে বলা কিংবা একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নিতে বলার অর্থ হলো বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে বলা। বিভ্রান্তি ও বিকৃতির স্বীকৃতি দেওয়া।
অ্যানোরেক্সিয়া (Anorexia) নামের রোগ হলে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছা অস্বাভাবিক রকম কমে যায়। সবসময় ওজন বেড়ে যাবার আতঙ্ক কাজ করে। অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে। এ ধরনের রোগীরা বিপজ্জনক রকমের আন্ডারওয়েট হলেও নিজেদের মোটা ভাবে। তাদের এই ভাবনাকে কি মেনে নেওয়া উচিত? নাকি তাদের চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিং দরকার?

বডি আইডেন্টিটি ইন্টেগ্রিটি ডিসঅর্ডার নামে একটা মানসিক রোগ আছে। এই অসুখ হলে রোগী মনে করতে শুরু করে যে তার শরীরের কোনো একটা অংশ আসলে তার না। হয়তো নিজের ডান পা-কে তার কাছে অপরিচিত লাগতে শুরু করে। তখন সে ঐ পা কেটে বাদ দিতে চায়।

শারীরিকভাবে তাদের কোনো সমস্যা নেই। শরীরের যে অংশটা তারা বাদ দিতে চাচ্ছে, সেখানেও কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা তাদের মনে। কোনো কারণে অপারেশনে করে হাত বা পা কেটে ফেলতে হয়েছে, এমন মানুষের প্রতি এ ধরনের রোগীদের মধ্যে তীব্র ঈর্ষা কাজ করে।

এমন রোগীদের চিকিৎসা কী হওয়া উচিত? তাদের কি অপারেশন করে নিজেদের হাত-পা কেটে ফেলতে দেওয়া উচিত?

না, এক্ষেত্রে সবাই বলবে, শরীর সুস্থ, রোগটা মনে। অসুস্থ মনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য শরীরের ক্ষতি না করে, মনের চিকিৎসা করা জরুরি।

কিন্তু ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। মনের সমস্যার চিকিৎসা নিয়ে কারো মাথাব্যাথা নেই, শুধু শরীর বদলাতে বলা হচ্ছে।

মনের অসুখের চিকিৎসার বদলে শরীরকে বদলানো হচ্ছে। কেউ এসে বলছে সে ট্র্যান্সজেন্ডার, ব্যস সেটা মেনে নিয়ে বলা হচ্ছে শরীর বদলে ফেলতে। মনের রোগ ভালো করা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাচ্ছে না কেউ।

শুধু তাই না, কিছু মানুষের মানসিক বিকারের কারণে পুরো সমাজকে তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে আইন পাল্টাতে। এটা কীভাবে যৌক্তিক

স্রেফ 'মনে হওয়া', নিছক আবেগ আর অনুভুতি দিয়ে বাস্তবতাকে ভুলে থাকা যায় না। একজন পুরুষকে নারী হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ নারীত্বের ধারণাকে ধ্বংস করা। একজন নারীকে পুরুষ হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ পুরুষত্ব অর্থহীন সাব্যস্ত করা।

আপনি যখন অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলবেন, অসুস্থতাকে সুস্থতা বলবেন তখন সেটা প্রভাবিত করবে পুরো সমাজকে। চিন্তা করুন, আপনি যখন পাঠ্যবইয়ে আর ক্লাসরুমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ শেখাবেন, তখন কিশোর-কিশোরীদের উপর এর প্রভাব কেমন হবে? আপনি যখন এই আচরণকে স্বাভাবিক বলবেন, তখন সেটার ফলাফল কী হবে? মানসিক অসুস্থতা আর আচরণগত বিকৃতিকে যখন মিডিয়ার মাধ্যমে রংচং চড়িয়ে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে, তখন কী হবে? বিকৃতির স্বীকৃতির অর্থ সেটার স্বাভাবিকীকরণ এবং প্রসার।

পরিবার ও সমাজের অনিবার্য পতন

LGBTQ+ মতবাদ নারী এবং পুরুষের মাঝে বিয়ের মাধ্যমে গড়া উঠা পরিবার ধারণাকে অস্বীকার করে। প্রচলিত পরিবারের ধারণা বা কাঠামো সমাজে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এটি মানসিক ও সামাজিক সুস্থতার ভিত্তি তৈরি করে এবং নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সুরক্ষিত রাখে। পরিবার শুধুমাত্র সদস্যদের অর্থনৈতিক ও শারীরিক সুরক্ষা দেয় না; বরং এটি সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা, এবং পারস্পরিক সহানুভূতির শিক্ষাও দেয়।

একটি সুসংগঠিত পরিবার শিশুদের সুরক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে যা তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে। পরিবার কাঠামো মূলত সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে সদস্যরা একে অপরের প্রতি সমর্থন এবং আস্থা প্রদান করে। এছাড়াও, পরিবারের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়, যা সমাজের ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, প্রচলিত পরিবার কাঠামোতে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাও নিশ্চিত করা হয়, কারণ পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে প্রয়োজনীয় সময়, সহায়তা ও উদ্দীপনা দিয়ে থাকে। পরিবার একটি নির্ভরযোগ্য সামাজিক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একতা বজায় থাকে, যা একাকিত্ব এবং মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে গ্রহণ করার ফলাফল হলো বিভিন্ন যৌন বিকৃতিকে স্বাভাবিক ও বৈধ বলে মেনে নেওয়া। নারী এবং পুরুষের মাঝের বিভেদ, সীমারেখা মুছে দেওয়া। যে নিজেকে যা দাবি করবে তা গ্রহণ করে নেওয়া। কারো শরীরের দিকে আর তাকানো হবে না। শুধু দাবির দিকে তাকানো হবে। দেহ যদি অর্থহীন হয় তাহলে অর্থহীন হয়ে যাবে নারী, পুরুষ, বিয়ে, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা এবং পরিবারের মতো ধারণাগুলোও। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ মূলত ভাষাগত, চিন্তাগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আইনীভাবে এই বিভাজনগুলো মুছে দেয়ার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা আন্দোলন। এ মতবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সৃষ্টি ও সমাজের সব কাঠামো ভেঙে ফেলা।

শিশুদের মাঝে লিঙ্গ সংশয় বৃদ্ধি

ইংল্যান্ডের জেন্ডার ক্লিনিকে পাঁচ বছরে (২০০০-২০০৫) যেখানে জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার (লিঙ্গ সংশয়) রেফারেল কেইস ছিল মাত্র ১৮ জন, ২০০৯-২০১০ সালে ৭৭ জন, সেখানে ১০ বছরে (২০২০-২০২১) লাফ দিয়ে বেড়ে হয়েছে ৩,৫৮৫ জন (অর্থাৎ ৪,৫৫৫%)। এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে কেননা ২০২১ সালে অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা ছিল ৫,৩০০ জন। ২০২৪ সালে অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৬ হাজার (১৫,৯২৮)। গত এক যুগে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সংখ্যা বেড়েছে সুইডেনে ১৫০০% , ডেনমার্কে বেড়েছে ৮৭০০% । আমেরিকায় গড়ে ১১ বছর বয়সী মেয়ে শিশু এবং ১৩ বছর বয়সী ছেলে শিশুরা জেন্ডার ডিসফোরিয়ার সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হচ্ছে ।

জন্মগত লিঙ্গের সঙ্গে একজন ব্যক্তির জেন্ডার আইডেন্টিটি (সে নিজেকে যা মনে করে) অমিল হলে মানসিক চাপ বা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এই মানসিক অস্থিরতা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটায়, তখন এই অবস্থাকে জেন্ডার ডিসফোরিয়া বলা হয়। ২০১৩ সালের আগে জেন্ডার ডিসফোরিয়াকে "Gender Identity Disorder (GID)" নামে মানসিক রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে ২০১৩ সালে এটি মানসিক রোগের তালিকা থেকে সরিয়ে আরও ইতিবাচক অর্থে 'Gender Dysphoria' নামে পরিবর্তিত করা হয়।৫]।

কোনো শিশুর জেন্ডার ডিসফারিয়া দেখা দিলে তাকে যত দ্রুত সম্ভব জেন্ডার-ইতিবাচক চিকিৎসার (শিশুটি নিজেকে যে লিঙ্গের মনে করে সেই অনুযায়ী রূপান্তর করার) মাধ্যমে অস্থিরতা বা মানসিক চাপ কমানোর প্রচেষ্টা করা হয়, এবং এটি পাশ্চাত্য দেশগুলোতে একটি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০২০ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে ট্রান্সজেন্ডার এবং লিঙ্গবৈচিত্র্য নিয়ে মিডিয়া কভারেজে বাড়ার সাথে শিশুদের জেন্ডার ডিস্ফোরিয়ার রেফারেল রেট বাড়ার যোগসূত্র রয়েছে । অস্ট্রেলিয়ায় ৫০০০ রেফারেল কেইসের ডাটা এনালাইসিস করে এই রিলেশন পাওয়া গেছে। সহজভাবে বলা যেতে পারে, যত বেশি মিডিয়ার প্রচারণা ততবেশি লিঙ্গ সংশয়ের কেইস।

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে বাংলাদেশে তোলপাড়

পাঠ্যপুস্তকে ট্রান্সজেন্ডারবাদ অন্তর্ভুক্ত করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সারাদেশব্যাপী যে প্রতিবাদ হয়েছে, তা LGBTQ+ ইস্যুতে বিশ্বেই বিরল। এমন প্রতিক্রিয়া বিশ্বের আর অন্য কোনো দেশে দেখা যায়নি। বাংলাদেশে ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করলেও সাধারণ মানুষ ২০২২ সালের আগে তা উপলব্ধি করতে পারেনি। মূলত হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার শব্দ সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে। পশ্চিমা অর্থায়ন এবং কারিগরি সহায়তায় ট্রান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং সংসদে পাশ করানোর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল।

এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যক্তিগতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলাম। মাঠ পর্যায়ে আলিমদের সচেতন করতে গিয়ে অনুধাবন করলাম যে তারা এই বিষয়ে কথা বলে সরকারের রোষানলে পড়তে চান না, গ্রেফতার আতঙ্ক তাদের মধ্যে কাজ করত।

নারী দিবস উপলক্ষে এক ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্টকে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বক্তব্য দিতে বাঁধা দেওয়ার পর ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি দেশে ভাইরাল হয়ে যায়। এর মাস দু'য়েক পর ব্র্যাকের খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব এক সেমিনারে ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে আলোচনা করার সময় শরীফ থেকে শরীফার গল্পটি ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানান। সেই সেমিনারে আমার বক্তব্যও ভাইরাল হয়েছিল।

অতঃপর, আসিফ মাহতাবকে চাকরিচ্যুত করার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। একই ইস্যুতে আমার প্রতিষ্ঠান (আইইউবি) আমাকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের কারণে সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। শরীফার গল্পের পাতার ছিঁড়ে প্রতিবাদ সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে, ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে একটি নাটক প্রচারিত হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তা ভাইরাল হয়, যার কারণে বাংলাদেশের ওয়ালটন কোম্পানি জনপরিসরে দুঃখ প্রকাশ করে এবং সেই অভিনেতাও ক্ষমা চান। এরপর আড়ংয়ের শিশুদের পাঞ্জাবীতে সমকামিতার প্রতীক ব্যবহার করার ইস্যুটি আবারও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়, এবং ব্র্যাক ও বিকাশকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। পপুলার ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বনফুল মিষ্টির ব্র্যান্ড LGBTQ+ ইস্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়। LGBTQ+ নিয়ে জনসম্পৃক্ততা নীতি পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের অবস্থান

ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে মন্তব্য-

- কেউ চাইলেও লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না অথবা পুরুষ পুরুষই, নারী নারীই- বিশ্বে আলোড়ন তৈরি করে।

আমরা এমন সময়ে বাস করছি যখন আমেরিকার মতো উন্নত দেশের সংসদে বিতর্কের বিষয় হয়-পুরুষ কি গর্ভে সন্তান ধারণ করতে পারে। এ বছরের শুরুতে জেলখানায় এক ট্রান্সজেন্ডার নারী (জন্মগত পুরুষ) প্রকৃত নারীকে (রুমমেট) ধর্ষণের ইস্যুতে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে (১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) বাধ্য হোন।

স্কুলের পাঠ্যক্রমে ট্রান্সজেন্ডার বা এলজিবিটি মতাদর্শ অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গত ২০ সেপ্টেম্বর কানাডার লক্ষ লক্ষ (মিলিয়ন মার্চ) পিতামাতা রাস্তায় নেমে আসেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ট্রান্সজেন্ডার একটি বড় ইস্যু।

তুরস্কের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এলজিবিটি বড় একটি ইস্যু ছিল। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এরদোয়ান বলেন, এই বিজয় এলজিবিটি মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিজয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ট্রাডিশনাল মূল্যবোধ রক্ষার্থে এলজিবিটির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

চায়নাও একই মনোভাব পোষণ করে, এলজিবিটি গোষ্ঠীর প্রাইড মাসে রঙধনু পতাকা বহনের অপরাধে দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের মৌলিক পার্থক্য না বুঝার করার কারণে ২০১৮ সালে পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার বিল সংসদে পাস হয়। কিন্তু জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মনস্তাত্ত্বিক জেন্ডার পরিচয় অন্তর্ভুক্তির কারণে সমাজে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে বিধায় কোর্ট ১৭ মে ২০২৩ আইনটি বাতিল ঘোষণা করে।

সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলো এলজিবিটির বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিয়েছে। এমনকি উগান্ডা পশ্চিমা ভিসা নিষেধাজ্ঞা, বিশ্বের ব্যাংকের ঋণ স্থগিত করার মতো অর্থনৈতিক ব্যাপারকেও উপেক্ষা করেছে।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শে বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে। জেন্ডার আইডেন্টিটি ইস্যুতে ইতালির সরকার পরিবর্তন হয়। সম্প্রতি হ্যাংগেরি ট্রান্সজেন্ডাদের লিগালাইজেশন বন্ধ ঘোষণা করেছে।

বিশ্বের বিখ্যাত টেক বিলিনিয়ার ইলন মাস্ক ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি মাঝে মাঝে সোস্যাল মিডিয়াতে পোস্ট দিয়ে পিতামাতাকে সচেতন রাখেন। এই বিষয়টির ভয়াবহতা অনুধাবন করাতে সম্প্রতি তিনি একটি ভিডিও

ডকুমেন্টারি (what is a woman) শেয়ার করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে বিশ্বের ১৭০ মিলিয়ন মানুষ ভিডিওটি দেখেছে।
উপরোক্ত ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এতো সোচ্চার হতেন না।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

ইসলাম আমাদের শেখায় এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে; যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা কিছু অদৃশ্য, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি মালিকুল মুলক। আসমান ও যমীনসমূহের একচ্ছত্র অধিপতি। বনী আদম বা মানুষ-মহান আল্লাহর দাস এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি।
আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন। আমাদের শরীর, সুস্থতা, আয়ু, জীবন-সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। তিনিই জন্ম, মৃত্যু এবং রিযিকের মালিক। কিন্তু এই শরীরের উপর আমাদের মালিকানা সার্বভৌম না। চাইলেই আমি এই শরীরকে ইচ্ছেমতো বদলাতে পারি না। ইচ্ছেমতো যেকোনো কিছু খেতে পারি না। চাইলেই যেকোনো ভাবে, যে কারো সাথে, যে কোনো সময় ভাগাভাগি করতে পারি না শরীরের উষ্ণতা। মহান আল্লাহর বেঁধে দেওয়া হালাল ও হারামের সীমানা মানুষকে মেনে চলতে হয়। মানুষ দুনিয়াতে অবাধ্য হলে আখিরাতে তার জন্য থাকবে শাস্তি।
আমাদের জান, মাল, সময়, সম্পদ, শরীর-সব ক্ষেত্রে সব অধিকারের উৎস হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ নিজে তার অধিকার আবিষ্কার করে না। রাষ্ট্র বা অন্য কোনো পার্থিব শক্তি অধিকার তৈরি করে না। জাতিসংঘের কোনো দলিল, কোনো সংবিধান কিংবা সমসাময়িক মানুষের ধ্যানধারণা থেকে অধিকার আসে না। সৃষ্টির অধিকার আসে সৃষ্টির মালিকের কাছ থেকে। মানুষ সার্বভৌম না। মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টি নিজের নিয়ম বানাতে পারে না। আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার বাইরে আর কোনো কিছু করার অনুমোদন মানুষের নেই। আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তার অনুমোদন দেওয়ার অধিকারও মানুষের নেই।
মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হলো আল-ফুরকান, যার অর্থ হলো সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী।

আমরা জানি সত্যমিথ্যা, ভালোমন্দ, হারাম-হালাল নির্ধারিত হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। “যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্য পথ হতে দূরে সরে পড়লো।” [তরজমা, সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৬]
আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা। আসুন দেখা যাক, এ ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী সমাধান দেয়।

যৌনতা ও যৌন বিকৃতি: ইসলামের অবস্থান

এবার আসুন, সংক্ষেপে যৌনতা ও যৌন বিকৃতির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান জেনে নেওয়া যাক। যৌনতার ব্যাপারে সংক্ষেপে ইসলামের অবস্থান :
১। যৌনতা শুধুমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যে বৈধ। বিয়ের বাইরে নারী পুরষের যৌনসম্পর্ক জায়েজ নেই। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো দাসীর সাথে সম্পর্ক। এক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান আছে।
(সূরা আল মাআরিজ, ২৯-৩১; সূরা আল-মুমিনুন, ৫-৭; সূরা আল-ফুরক্বান, ৬৮; সূরা আল ইসরা, ৩২)।

২। যিনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি বেত্রাঘাত, বিবাহিত যিনাকারীর শাস্তি রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড।
৩। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নাজায়েজ। নির্জনে তো বটেই, জনপরিসরেও সামাজিকভাবে নারী ও পুরুষের অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকতে হবে। শরীয়াহসম্মত কারণ ছাড়া অনর্থক কথা বলা যাবে না। পর্দা এবং নারী-পুরুষের পৃথকীকরণের এই নিয়ম মেনে চলতে হবে মাহরাম ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে। মাহরাম হলো এমন সব নারী-পুরুষ, যাদের সাথে বিয়ে হারাম।

৪। নারী-পুরুষ উভয়কেই পর্দা করতে হবে। পোশাক পরতে হবে শরীয়াহর নির্দেশনা অনুযায়ী। কেবল শরীর ঢাকা যথেষ্ট না, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শরীরের কাঠামো বোঝা না যায়। এই কথা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে দু'জনের জন্য পর্দা করার মাত্রা ভিন্ন, পর্দা নারীর জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৫। নারী-পুরুষ উভয়কেই দৃষ্টি সংযত রাখতে হবে। তবে পুরুষের জন্য চোখের হিফাযত বিশেষভাবে জরুরি ও প্রযোজ্য।

৬। চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। উল্লেখিত বিধিবিধানগুলোর অন্যতম লক্ষ্য, যিনার কাছে যাওয়া থেকে মানুষকে বিরত রাখা। যেসব কাজ বা আচরণের মাধ্যমে যিনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে, তার সবই ইসলাম প্রতিরোধ করে। আল্লাহ বলেছেন,
'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ এবং তা কতই না মন্দ পথ! (যা অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়)।' [তরজমা, সূরা বনী ইসরাঈল, ৩২]
একই সাথে ইসলাম বিয়েকে উৎসাহিত করে। নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছানোর পর মানুষ যখন নিজের ভেতরে যৌন চাহিদা অনুভব করবে, তখন সে বিয়ে করবে। এভাবে সে হালালভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।
৭। যৌনতা নিছক বিনোদন কিংবা শারীরিক চাহিদা মেটানোর পদ্ধতি না। মহান আল্লাহ এর সাথে সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়াকেও যুক্ত করে দিয়েছেন। যৌনতা পরিবারের সাথে যুক্ত, আর পরিবার হলো সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি। এজন্যই যৌনতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ সুনির্দিষ্ট এবং কঠোর নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। যিনার শাস্তি এতটা গুরুতর হবার এটি অন্যতম কারণ। পরিবার এবং বংশগতির সুরক্ষা ইসলামী শরীয়াহর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

দৃষ্টিভঙ্গি

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ইসলাম যৌনতাকে সত্তাগতভাবে নেতিবাচক বা খারাপ কিছু মনে করে না। এটি মানুষের সহজাত চাহিদা এবং বৈধ যৌনতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। রাসূলুল্লাহ স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গতার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। [৫০০] আরেক হাদীসে এসেছে, স্ত্রীর সাথে যৌনতা সাদাকাহ। [৫০১] যদি নিয়ত সঠিক থাকে, যদি যৌনতার উদ্দেশ্য হয় হালালভাবে নিজের চাহিদা পূরণ করা, নিজেদের হারাম থেকে সুরক্ষিত রাখা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পূরণ করা অথবা নেক সন্তান কামনা করা, তাহলে যৌনতা নেক আমল হিসেবে গন্য হতে পারে।

মানুষ নারী এবং পুরুষ

ইসলাম আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গ, ট্র্যান্সজেন্ডার বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলো মানুষের তৈরি করা শ্রেণীবিভাগ।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের কিছু আয়াত:

وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوۡجَيۡنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰ
আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন- পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নাজম, আয়াত ৪৫]

وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ
আর শপথ তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও নারী। [সূরা আল-লাইল, আয়াত ৩]

وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ
বস্তুতঃ পুত্র কন্যার মতো নয়। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৬)

Ar-Rum 30:24

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ خَوۡفٗا وَطَمَعٗا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَيُحۡيِۦ بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। [তরজমা, সূরা আর-রূম, আয়াত ২১]

An-Nisa' 4:1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا
كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১]

দেহ আর জেন্ডারের পার্থক্য ইসলাম স্বীকার করে না। জেন্ডার আধুনিক পশ্চিমের কিছু তাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের তৈরি করা বানোয়াট ধারণা, শরীয়াহতে যার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। ব্যক্তির কী 'মনে হয়' তা দিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বদলায় না। মহান আল্লাহ দেহ আর আত্মপরিচয়ের মধ্যে পার্থক্য করেননি। শরীয়াহতে জন্মগত লিঙ্গ আর মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গবোধ বলে আলাদা কিছু নেই। ইসলাম দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ যাকে পুরুষের দেহ দিয়েছেন সে পুরুষ। যাকে তিনি নারীদেহ দিয়েছেন সে নারী। এবং মহান আল্লাহ ভুল করেন না। কেউ ভুল দেহে জন্মায় না। যদি কারও মনে হয় সে ভুল দেহে আটকা পড়েছে, তাহলে তার সমস্যা মনে। চিকিৎসার মাধ্যমে মনের রোগের সমাধান করতে হবে। শরীরকে বদলানো যাবে না।

মুসলিম হিসেবে আমরা স্বীকার করি যে, নারী ও পুরুষের দেহের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ও ভূমিকা আছে, যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দেহের পাশাপাশি সৃষ্টিগতভাবেই নারী ও পুরুষের চিন্তা, চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। শরীয়াহ এই পার্থক্যগুলোকে আমলে নেয়। এ কারণেই সামগ্রিকভাবে শরীয়াহর বিধান নারী ও পুরুষের জন্য এক হলেও, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে (পোশাক, উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য ইত্যাদি) শরীয়াহর হুকুমের পার্থক্য হয়।

তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই:

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তৃতীয় লিঙ্গ বলে কিছু নেই। যদি কোনো মানুষের দেহে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকে, অর্থাৎ কেউ যদি আধুনিক চিকিৎসার পরিভাষায় আন্তঃলিঙ্গ বা Intersex হয়, সেক্ষেত্রেও তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য করা হবে। তৃতীয় কিছু না। ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় এ ধরনের মানুষকে বলা হয় 'খুনসা'।

যাদের শারীরিক ত্রুটি আছে, তাদের শরীরেও পুরুষ বা নারী কোনো একটি দিকের প্রাধান্য থাকে। সেটা অনুযায়ী তাদের বিচার করা হয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের কাছাকাছি এমন 'হিজড়া'দেরকে রাসূলুল্লাহ পুরুষ হিসেবে এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য নারীদের কাছাকাছি এমন 'হিজড়া'দের নারী হিসেবে বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু এমন ব্যক্তি নারী নাকি যদি নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ থাকে (অত্যন্ত দুর্লভ), সেক্ষেত্রে সে কোন দিক দিয়ে প্রস্রাব করছে, তার ভিত্তিতে তাকে নারী অথবা পুরুষ গণ্য

করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, এ ধরনের কোনো ব্যক্তির প্রস্রাব যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয় তাহলে সে পুরুষ এবং সে সমাজ ও আইনের চোখে পুরুষ হিসেবেই গণ্য হবে। সে স্বাভাবিকভাবে পুরুষের মতোই জীবনযাপন করবে। যদি এভাবে বোঝা সম্ভব না হয়, তাহলে বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো হবে।

একেবারে কোনোভাবেই যদি বোঝা না যায়, তাহলে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীরের প্রজননব্যবস্থা শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, নাকি ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, তা খুব সহজে জানা সম্ভব। কাজেই ইসলামের অবস্থান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো জটিলতা নেই।

অস্ত্রোপচার

কোনো ব্যক্তির প্রজননব্যবস্থা পুরুষের, অর্থাৎ তার দেহ শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য তৈরি, কিন্তু যৌন বিকাশের ত্রুটির কারণে বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন স্তনের মতো অঙ্গ) আছে-এমন ক্ষেত্রে সেই ত্রুটি দূর করার জন্য শর্তসাপেক্ষে অস্ত্রোপচারের বৈধতা বর্তমান যুগের আলিমগণ দিয়েছেন। একই কথা প্রযোজ্য নারীর ক্ষেত্রেও। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক কন্যাশিশুর জন্মের সময় যোনীপথ বন্ধ থাকে, যা অপারেশনের মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব, এ ধরনের চিকিৎসা গ্রহণকে ইসলাম নিষিদ্ধ বলে না।

উল্লেখ্য, এ ধরনের অস্ত্রোপচার সীমিত পরিসরে জায়েজ এবং এর উদ্দেশ্য, একজন মানুষের শরীরকে তার দেহের প্রজনন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা। বিকলাঙ্গতা দূর করা। ট্র্যান্সসেক্সুয়ালবাদ বা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদে যে 'লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি' করা হয়, তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষের 'লিঙ্গ পরিবর্তন' জাতীয় কোনো অস্ত্রোপচার ইসলামী শরীয়াহতে বৈধ না।

শারীরিকভাবে সুস্থ, কিন্তু আচরণ বিপরীত লিঙ্গের মতো

এ তো গেল আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্সের কথা। যাদের শারীরিক ত্রুটি নেই কিন্তু আচার-আচরণ বিপরীত লিঙ্গের মতো, তাদের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান কী?

ইচ্ছাকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণ করা এবং অনুকরণ করা নিষিদ্ধ। শারীরিকভাবে সুস্থ কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নারীর অনুকরণ করে এমন পুরুষদের শরীয়াহতে মুখান্নাস বলা হয়। তাদের ব্যাপারে অবস্থান কী হবে, এ নিয়েও হাদীস থেকে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন:

নবী নারীর সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণকারিণী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন, তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। (সহীহ বুখারী,মিশকাত হাদীস নং ৪৪২৯)
ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন: নবী অমুককে বের করেছেন এবং উমার অমুককে বের করে দিয়েছেন।
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,
হাতে পায়ে মেহেদি রাঙানো একজন মুখান্নাসকে নবীর কাছে নিয়ে আসা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই লোকের কী হয়েছে? তাঁকে বলা হলো: আল্লাহর রাসূল! সে নারীদের চলন-বলনের অনুকরণ করে। তাই তিনি তার ব্যাপারে দেশান্তরের আদেশ জারি করলেন এবং তাকে আন-নাকি নামক স্থানে নির্বাসন দেওয়া হলো।

রাসূলুল্লাহ আরও বলেছেন,
'আল্লাহ সেসব মানুষদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন, যারা তাঁর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনে (সহীহ বুখারী; হাদিস নং ৪৮৮৬)

কাজেই সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়ে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে, অনুকরণ করে এবং 'লিঙ্গ পরিবর্তন' সার্জারি করে, তাহলে এর সবগুলোই হারাম।
যদি জন্মগতভাবে কারও স্বভাবে (দেহে না) বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন ছোটবেলা থেকেই কোনো পুরুষের স্বভাব ও চালচলনে যদি মেয়েলী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এক্ষেত্রে তার আবশ্যক দায়িত্ব হলো সাধ্যমতো সেগুলো বদলানোর চেষ্টা করা। যথাসাধ্য চেষ্টার পরও যদি পরিবর্তন না আসে এবং সে যদি হারাম কোনো কাজ না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে না। অন্যদিকে সে যদি নিজেকে বদলানোর চেষ্টা না করে উল্টো নারীদের পোশাক পরতে শুরু করে, নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। কাজেই কোনো দিক থেকেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বৈধতা ইসলামে নেই। এটি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

একটি বিষয় এখানে মাথায় রাখা জরুরি। তা হলো, কোনো মেয়ে খেলাধুলা করতে পছন্দ করে বা কোনো ছেলে রান্না করতে ভালোবাসে, এর ভিত্তিতে তাদের বিপরীত লিঙ্গের মানুষ বলা বা তারা ভুল দেহে আটকে পড়েছে এমন দাবি শরীয়াহতে অগ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধরনের প্রচলন বা উরফ থাকে। ইসলামী লিঙ্গের মানুষ বলা বা তারা 'ভুল দেহে আটকা পড়েছে', এমন দাবি শরীয়াহতে ফিকহের আলোচনায় সামাজিক প্রচলন বা উরফকে

আমলেও নেওয়া হয়। কিন্তু সামাজিক প্রচলন বা রীতিনীতি কোনো অবস্থাতেই শরীয়াহর স্পষ্ট বিধান এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা নির্ধারিত বাস্তবতা, যেমন মানবদেহের বাস্তবতার ওপর স্থান পাবে না।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ট্যান্সজেন্ডারবাদ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। বিতাড়িত হবার সময় ইবলীস মহান আল্লাহকে বলেছিল,

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفۡرُوضًا

وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيۡطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانًا مُّبِينًا

'যার প্রতি আল্লাহ লানত করেছেন। আর সে (আল্লাহকে) বলেছিলঅবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করবো। আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবো, মিথ্যা আশ্বাস দেবো এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেবো, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করবো, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৮-১১৯]

এ আয়াতের স্পষ্ট প্রতিফলন আজ আমরা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের মধ্যে দেখতে পাই। ট্যান্সজেন্ডার আক্ষরিক অর্থেই একটি শয়তানি এজেন্ডা। মহান আল্লাহ বলেছেন,
'আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' [তরজমা, সূরা আন-নিসা, আয়াত ১১৯]

ট্রান্সজেন্ডারবাদ ও সমকামিতার স্বাভাবিকীকরণ

ট্র্যান্সজেন্ডারের অবশম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি, যা ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করেছি। সমকামিতা জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের কারণে আল্লাহ লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের ৭০টির বেশি আয়াতে

লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন,

'আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয়।' [ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং ১৬৮০৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬৫]

ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন

'অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি যে কওমে লূতের অনুরূপ (অর্থাৎ সমকামিতা) করে।' [মুসনাদ ইমাম আহমাদ, সহীহ আল-জামি' আল-আলবানী]

ইসলামের দিক থেকে সমকামিতা শুধু হারামই না, বরং গুনাহর মধ্যেও অত্যন্ত গুরুতর একটি গুনাহ। চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন। যারা এই কাজে লিপ্ত তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কাজেই একজন মুসলিমের পক্ষে কোনোভাবেই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ মুসলিমদের দায়িত্ব। এ দায়িত্বের জায়গা থেকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের বিরুদ্ধে মুসলিমদের অবস্থান নিতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে বাঁচাতে হলে অবস্থান নিতে হবে বিকার ও বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণের এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বাভাবিকীকরণের ফলাফল হবে সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে উপড়ে ফেলা।

সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য

সমলিঙ্গের সাথে যৌনতা কবীরা গুনাহ। জঘন্য অপরাধ। এই অপরাধের কারণে আল্লাহ লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কুরআনের সত্তরের বেশি আয়াতে লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি পাঠানো শাস্তির আলোচনা এসেছে।

“লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? আমি তো তোমাদের জন্য (প্রেরিত) একজন বিশ্বস্ত রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহর ভয় অবলম্বন করো এবং আমার আনুগত্য করো। 'আর আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো

সৃষ্টিকুলের রবের কাছেই আছে। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরাই কি কেবল পুরুষদের সাথে উপগত হও? আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা ত্যাগ করে থাকো। বরং তোমরা তো এক সীমালজ্ঘনকারী সম্প্রদায়।'
তারা বলল, 'হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'
লূত বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি।' 'হে আমার রব! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, তারা যা করে তা থেকে রক্ষা করুন।'
অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজন সবাইকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর অন্যদের সকলকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিলাম। আর আমরা তাদের ওপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এ বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই বিশ্বাস করে না, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়।" [তরজমা, সূরা আশ-শুআরা, ১৬০-১৭৪]

তাদের প্রতি প্রেরিত শাস্তির বর্ননায় আল্লাহ বলেছেন-

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

'আমি তাদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। অতএব দেখো! গুনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে।' [, সুরা আল-আ'রাফ, ৮৪]

فَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا جَعَلۡنَا عَٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهَا حِجَارَةٗ مِّن سِجِّيلٖ مَّنضُودٖ

'অতঃপর যখন আমাদের আদেশ আসলো, তখন আমরা জনপদকে উলটে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম
পোড়ামাটির পাথর।' [সূরা হুদ, ৮২]

উল্লেখ্য, 'পশ্চাতে অবস্থানকারী বৃদ্ধা' ছিল লূত আলাইহিস সালামের স্ত্রী। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই গুনাহতে লিপ্ত ছিলেন না, কিন্তু যারা এই কাজ করতো তাদের সমর্থক ছিলেন, তাদের সহায়তা করেছিলেন। এ অপরাধের কারণে একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, নবীর দুআ সত্ত্বেও, তিনি মহান আল্লাহর আযাবের ভেতর পড়ে গেছেন। আল্লাহ শুধু বিকৃত যৌনাচারীদের শাস্তি দেননি, যারা কেবল সমর্থন দিয়েছে, তাদেরকেও শাস্তির আওতায় এনেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ۝

যারা কুফরি করে, আল্লাহ তাদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর, তারা ছিল আমাদের বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলো, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো। [সূরা তাহরীম, ১০]

আজ যারা নিজেদের মুসলিম দাবি করার পর মানবাধিকার, স্বাধীনতা কিংবা সেক্যুলারিসমের নামে বিকৃত যৌনতার সমর্থনে কথা বলে, কুরআনের আয়াতে তাদের জন্য স্পষ্ট হুশিয়ারি আছে।

সমকামিতা চরম- সীমালঙ্ঘন

ইসলামের দিক থেকে সমকামিতা শুধু হারাম না, বরং চরম পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন। পুরুষে পুরুষে যৌনতা যিনার চেয়েও গুরুতর গুনাহ। কুরআনে আল্লাহ যিনার ব্যাপারে বলেছেন,

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا

এবং ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা।(ইসরা:৩২)

এ আয়াতে যিনার ক্ষেত্রে ফাহিশাহ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষে পুরুষে যৌনতার ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ۝

“আর আমি প্রেরণ করেছি লূতকে। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি'? [তরজমা, সূরা আল-আ'রাফ, ৮০]

এই আয়াতে 'আল-ফাহিশাহ' ব্যবহৃত হয়েছে। নির্দিষ্টভাবে 'আল' যুক্ত হয়ে এই কাজের তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করেছে।

নবী বলেছেন,
'যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর! যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ঘৃণিত কাজ করবে, আল্লাহ তাআলার লানত আরোপিত হোক তার ওপর!' (মুসনাদু আহমাদ ২৯১৫)

নবী এখানে তিনবার লানতের বদদুআ করেছেন। তিনি কিন্তু যিনাকারীকে লানত করেননি। সমকামিতা যিনার চেয়েও জঘন্য অপরাধ।

আমেরিকার 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' এর সুবাদে পশ্চিমা চিন্তা থেকে প্রভাবিত হয়ে এবং পশ্চিমা সরকারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় গত দুই দশক ধরে 'মডারেট ইসলাম' নামে নতুন একটি ধারা তৈরি হয়েছে। এদের প্রধান কাজ হলো, আধুনিকতার ছাঁচে ইসলামের নতুন নতুন 'ব্যাখ্যা' তৈরির চেষ্টা করা। এই ধারার অনেকেই সমকামিতাকে যিনার সাথে তুলনা করতে চায়। তারা বলে, ইসলামে যেহেতু বিয়ে-বহির্ভূত সব ধরনের যৌনতাই হারাম, তাই সমকামিতাও হারাম। সমকামিতা যিনার মতোই। ওপরের হাদীস এবং এ ব্যাপারে আলিমগণের বক্তব্যই তাদের এ অবস্থানকে ভুল প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে আরেকটি হাদীস প্রাসঙ্গিক। ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,
'অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে কোনো জন্তুর সাথে সঙ্গম করে। অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তি, যে কওমে লূতের অনুরূপ (অর্থাৎ সমকামিতা) করে। (মুসনাদ আহমাদ)

লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ পুরুষে পুরুষে যৌনতার তুলনা করেছেন পশুসঙ্গমের সাথে, যিনার সাথে না। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে পশুসঙ্গম আর যিনা—দুটিই মারাত্বক সীমালঙ্ঘন। কিন্তু দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক

আকর্ষণ সহজাত। এই আকর্ষণ অস্বাভাবিক না। কিন্তু বিয়ের বাইরে এই আকর্ষণকে বাস্তবায়ন করা নিষিদ্ধ। অন্যদিকে কোনো মানুষের মধ্যে পশুর সাথে সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা থাকবে, এটি চরম অস্বাভাবিকতা এবং বিকৃতি। এর সাথে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের তুলনা হয় না। এই ধরনের জঘন্য আকাঙ্ক্ষা কারও মধ্যে তৈরি হবার অর্থ হলো, তার মধ্যে বিকৃতি আছে। একই কথা প্রযোজ্য সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ক্ষেত্রে। এই আচরণ বিকৃতি, কারও মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা থাকাও বিকৃতি।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ করুন। ওপরের হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তির ওপরে আল্লাহর অভিশাপ'। তিনি কিন্তু বলেননি 'ঐ কাজের ওপর অভিশাপ'। আধুনিক সমাজে একটা কথা খুব প্রচলিত, 'পাপকে ঘৃণা করুন, পাপীকে নয়'। এসব সস্তা বুলি ব্যবহার করে অনেকেই সমকামিতার সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ এর হাদীস তাদের এ ধরনের চিন্তাধারাকে সরাসরি খণ্ডন করে। আরেক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ জানিয়েছেন,

'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না, যে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়। (তিরমিযি, ১১৬৫)

এখানেও ব্যক্তির কথা এসেছে। যারা এই গুনাহ করবে আল্লাহ তাদের দিকে রাহমাহর দৃষ্টিতে তাকাবেন না, নবী এর এই বক্তব্যের সাথে কোনোভাবেই 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে না'-জাতীয় চিন্তাভাবনাকে মেলানো যায় না।

শরীয়তে সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার শাস্তি

ইসলামের অবস্থান হলো, পুরুষে পুরুষের যৌনতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন,

'তোমরা যাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের অনুরূপ আচরণ করতে দেখো, সেই পাপাচারী এবং যার ওপর ঐ কুকর্ম করা হয়েছে, উভয়কে হত্যা করো।' (ইবনু মাজাহ, ২৫৬১, আবু দাউদ, ৪৪৬২, তিরমিযি ১৪৫৬)

সমকামে লিপ্ত পুরুষকে হত্যার ব্যাপারে সাহাবিগণের ঐকমত্য আছে। তবে হত্যার ধরন নিয়ে আছে মতপার্থক্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল বলেন, 'তোমরা ওপর-নিচের উভয়কেই রজম করে হত্যা করো।' (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২৬১০)

আবু বকর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং হিশাম ইবন আব্দুল মালিক রহিমাহুল্লাহ সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৫৩৮৯)

অন্যদিকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন,
'সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার ওপর পাথর মারা হবে।' (ইবনু আবী শাইবাহ, হাদীস নং ২৮৩২৮; বায়হাকী: ৮/২৩২.)

এই শাস্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ইসলামী শরীয়াহ দ্বারা শাসন করা শাসকের। সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার ব্যাপারে আলিমগণের অবস্থানের সারমর্ম তুলে ধরে ইমাম ইবনু কাইয়্যিম বলেছেন,
'সমকামিতা যেহেতু সামাজিক ভারসাম্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়, তাই এই জঘন্যতম অপরাধ দমন ও নির্মূলে শরীয়তও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। সমকামিতার অপরাধে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য প্রণয়ন করেছে কঠোর শাস্তির বিধান...
আবু বকর, আলী, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবির ইবনু যায়েদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মা'মার-প্রমুখ সাহাবি।
উল্লেখ্য, এখানে স্বেচ্ছায় সমলিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত লোকেদের কথা বলা হচ্ছে। কাউকে জোর করে এ কাজে বাধ্য করা হলে, সে দোষী হবে না। তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে না।

রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন এবং ইমাম যুহরী, রবীআহ ইবনু আবী আব্দির রহমান, ইমাম মালিক, ইসহাক ইবনু রাহুয়াই, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল প্রমুখ আলিমের নিকট সমকামিতার শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির চেয়েও কঠোর। সমকামী পুরুষ বা নারী বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত, সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে...
যারা এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন তারা উম্মাহর জুমহুর এবং একাধিক আলিম এ ব্যাপারে সাহাবাগণের মধ্যে ইজমা থাকার কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেছেন, আর কোনো গুনাহ সমলিঙ্গের সাথে যৌনতার মতো ভয়াবহ ফাসাদ নিয়ে আসে না। ফাসাদের দিক থেকে কুফরের পরই এর অবস্থান। এবং সম্ভবত এর ফাসাদ হত্যার চেয়েও নিকৃষ্ট হতে পারে। (ইবনুল ক্বইয়্যিম, আল জাওয়াবোল কাফী)

এ তো গেল দুনিয়ার শাস্তি। আর এ ধরনের লোকের জন্য আখিরাতের শাস্তি হলো আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেন না।.

ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে বিখ্যাত আলিমদের বক্তব্য ও ফতোয়া

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ হারাম—হাটহাজারী মাদরাসা

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে 'হারাম' ঘোষণা করে ফতোয়া দিয়েছে দেশের শীর্ষ ইসলামী বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রামের আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসা। একইসাথে দেশের অন্যতম প্রাচীন এ কওমি মাদরাসাটি এ মতবাদকে 'অভিশপ্ত' আখ্যা দিয়েছে। বুধবার (২৭ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির ফতোয়া ও ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ থেকে পাঁচজন মুফতি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে (ফতোয়া) এ ঘোষণা দেওয়া হয়। হাটহাজারী মাদরাসার মুখপত্র 'মাসিক মুঈনুল ইসলাম' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা মুনির আহমদ নয়া দিগন্তকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

https://www.dailynayadiganta.com/religion/801822/

ট্রান্সজেন্ডার-মতবাদকে-হারাম-ফতোয়া-দিলো-হাটহাজারী-মাদরাসা

জামিয়া মাহমুদিয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদরাসা থেকেও অনুরূপ ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া দারুল উলুম করাচি, দারুল উলুম দেওবন্দসহ আন্তর্জাতিক ফতোয়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে ফতোয়া প্রকাশ করেছে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব আলিম এর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন।

ট্রান্সজেন্ডার লোকদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

বিকৃত যৌনতায় আসক্ত মানুষদের মোটাদাগে দুটি শ্রেণি আছে। একদল হলো ঐসব লোক, যারা জেনেবুঝে বিকৃতিকে বেছে নেয়। একে উপভোগ করে, তৈরি করে বৈধতার অজুহাত। এরা হলো উলরিখস, হার্শফেল্ড, কিনসি, মানি আর এলজিবিটি অ্যাক্টিভিস্টদের মতো লোকেরা। এই দলের লোকেরা খুব ভালো করে জানে তারা আসলে কী চায় এবং কী করছে। তারা বিকৃতিকে পরিচয় বানায়। রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের বিকৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সমাজ ও সভ্যতা জুড়ে। এরা কওমে লূতের উত্তরসূরী, এদের মোকাবিলা করতে হবে।

আরেক দল হলো ঐসব মানুষ, যারা কোনো কারণে এমন বিকৃত আচরণে আসক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তারা এ থেকে বের হয়ে আসতে চায়। শৈশবে বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরা, সাজগোজ করা, যৌন নির্যাতন, মানসিক সমস্যা, সমকামী পর্ন-আসক্তি ইত্যাদি কারণে কোনো

কোনো ব্যক্তির সমলিঙ্গের প্রতি ক্ষণিক আকর্ষণ জন্মাতে পারে অথবা আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে তৈরি হতে পারে বিভ্রান্তি।

ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো, আমরা মানুষকে তার কাজ দিয়ে বিচার করি। কারও মধ্যে যিনা করার কিংবা মাদক ব্যবহারের ইচ্ছা থাকতে পারে। এই ইচ্ছার কারণে আমরা কাউকে দোষী বলি না। যদি সে এই ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে, তখন তাকে দোষী বলা হয়। তখন তাকে শাস্তি দেওয়া হয়। কাজেই কেউ যদি নিজের মধ্যে এমন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন না করে তাহলে শ্রেফ অতটক কারণে আমরা তাকে দোষী বলবো না। তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এমন আকাঙ্ক্ষা অনুভব করা স্বাভাবিক না। বরং বিকৃতি ও অসুস্থতা।

ইসলাম আমাদের সবার সাথে ইনসাফ করতে শেখায়। মানুষের সাথে আমাদের আচরণ হতে হবে নবী-এর সুন্নাহ অনুযায়ী এবং শরীয়াহর বিধানগুলোর আলোকে। এমন মানুষ যদি সাহায্য চায়, তাহলে তাকে সাহায্য করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। আক্রমণ করা, কটু কথা বলা কিংবা একঘরে করে রাখার বদলে চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। একইভাবে কেউ যদি গুনাহ করে ফেলার পর অনুতপ্ত হয়, তাওবাহ করে ফিরে আসতে চায়, এবং ভবিষ্যতে এই গুনাহ থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে তাকে আমাদের সাহায্য করা উচিৎ। এজন্য দরকার ইসলামী শরীয়াহর আলোকে যথাযথ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

সহানুভূতি বনাম স্বীকৃতি

কিন্তু ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি আর অসুস্থতার স্বীকৃতি এক না। অনেক পথশিশু দারিদ্র্য আর ছোটবেলার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সে মাদক ব্যবহার করা শুরু করে, অনেকে ব্লেড দিয়ে কাটাকাটি করে নিজের শরীরে। আমরা এসব শিশুদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করি। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে আমরা কিন্তু তাদের মাদক ব্যবহার কিংবা শরীরে কাটাকাটি করার অভ্যাসকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, 'এগুলো যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যতক্ষণ অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে, এ ধরনের আচরণে কোনো সমস্যা নেই।'

ঐ শিশুদের সাহায্য দরকার এটা যেমন সত্য, তেমনি ঐ আচরণ যে অস্বাভাবিক, তাও সত্য। আমাদের দায়িত্ব ঐ শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করা, এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না। নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান একই হওয়া উচিত।

স্বাধীনত বনাম অসুস্থতার স্বীকৃতি এক না। অনেক পথশিশু দারিদ্র্য আর ছোটবেলার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কারণে অল্প বয়সে মাদক ব্যবহার করা শুরু করে, অনেকে ব্লেড দিয়ে কাটাকাটি

করে নিজের শরীরে। আমরা এসব শিশুদের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করি। তাদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলে আমরা কিন্তু তাদের মাদক ব্যবহার কিংবা শরীরে কাটাকাটি করার অভ্যাসকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিতে পারি না। আমরা বলতে পারি না যে, 'এগুলো যার যার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। যতক্ষণ অন্য কারও ক্ষতি না হচ্ছে, এ ধরনের আচরণে কোনো সমস্যা নেই।'

ঐ শিশুদের সাহায্য দরকার এটা যেমন সত্য, তেমনি ঐ আচরণ যে অস্বাভাবিক, তাও সত্য। আমাদের দায়িত্ব ঐ শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে সাহায্য করা, এই অসুস্থতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না। নিজের শরীর বা আত্মপরিচয় নিয়ে সমস্যায় ভোগা মানুষদের ক্ষেত্রেও আমাদের অবস্থান

আর অস্বাভাবিক করে তোলা। এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাস এর জলজ্যান্ত প্রমাণ। অস্বাভাবিকতার স্বীকৃতির অর্থ সেটার প্রসার। এতে করে যারা অসুস্থ তাদের উপকার হবেই না, বরং দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি হবে। অপরিমেয় ক্ষতি হবে সমাজেরও।

এলজিবিটি আন্দোলন মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং চরম সীমালঙ্ঘন। একজন মুসলিমের পক্ষে কোনোভাবেই সমাজবিধ্বংসী এই মতবাদ ও আন্দোলনকে মেনে নেওয়া সম্ভব না। পুরো পৃথিবীও যদি এই মতবাদকে গ্রহণ করে তবু আমাদের এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

মুসলিম হিসেবে আমাদের মাপকাঠি হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের আরেকটি নাম হলো আল-ফুরকান, যার অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, হারাম-হালাল নির্ধারিত হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করা।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই সত্যপথ হতে দূরে সরে পড়লো।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৬)

আমাদের করণীয়:

নব্য আদ ও সামুদ জাতির লোকেরা সমকামিতার মিশন নিয়ে মুসলমানদের দ্বারপ্রান্তে হাজির। সমকামিতার ফেরিওয়ালারা ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি পুরোপুরি তাদের মতো হবেন। মহান আল্লাহ বলেন-

ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।(সুরা বাকারা: আয়াত ১২০)।

ইসলামকে জীবন থেকে পুরোপুরি ঝেটিয়ে বিদায় করতে না পারলে ওরা আমাদের পিছু ছাড়ছে না!! আজ আমরা চুপ করে থাকলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই ভয়াবহ পরিণতির শিকার হবে। এটি ঈমানের প্রশ্ন, মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করার প্রশ্ন। তাই দলমত নির্বিশেষে সবাই ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।
এ ভূখণ্ডে বিকৃত ও সীমালঙ্ঘনের এ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে এর জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে আমরা সবাই দায়ী থাকব।

আমাদের আহাল, পরিবার-পরিজন, সন্তান, আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা ঈমানের দাবি। যে কোনো মূল্যে এ ঘৃণিত মতবাদ রুখে দিতে হবে।
কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছেন নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাবের ফিরিশতারা
যারা আল্লাহ যা তাদের আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হন, তাই করেন।

তাই নিজেদেরকে ও পরিবার-পরিজনের জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে বেঁচে রক্ষা পাওয়ার মিশনে শামিল হতে হবে।

যৌন বিকৃতির এই আন্দোলন মোকাবিলার জন্য আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি-

কুরআনের আলোকে এবং ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা মোকাবিলার তিনটি ধাপ পাই-

১। বিশুদ্ধ আকীদাহ ও দ্বীনের ভিত্তি

দ্বীন ইসলামের ভিত্তি ছাড়া এলজিবিটি আগ্রাসনের মোকাবিলা করা সম্ভব না। গতানুগতিক রক্ষণশীলতা, কিংবা আধুনিকতার অন্য কোনো মতবাদ এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কাজে আসবে না। পাশ্চাত্যের রক্ষণশীলরা এই আন্দোলনের সামনে দাঁড়াতে পারেনি; কারণ, অধিকার আর স্বাধীনতার বড়ি আগেই তারা গুলে খেয়েছিল।

২। এলজিবিটি মতবাদ ও আন্দোলনের বাস্তবতার ব্যাপারে জানা ও জানানো

সমস্যা সমাধানের আগে সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হয়। তার ব্যাপারে জানতে হয়। প্রতিপক্ষকে বুঝতে হয়, পর্যবেক্ষণ করতে হয় তার কৌশল। তা না হলে সমস্যার সমাধান করা যায় না।

৩। এক ও দুইয়ের ভিত্তিতে যথাযথ কর্মকৌশল (স্ট্র্যাটিজি) নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করা

এলজিবিটি আন্দোলনের বাস্তবতা সম্পর্কে না-জানার কারণে অনেকেই বিভ্রান্ত হন। অধিকারের মোড়কে বিকৃতির প্রচার, দাতা-এনজিও-অ্যাকটিভিস্টদের নেটওয়ার্ক আর কৌশলগুলো সম্পর্কে আমাদের সমাজ অজ্ঞ। এ অজ্ঞতার সুযোগ নেয় ওরা পুরোদমে। অজ্ঞতার সুযোগে আমাদের পাঠ্যবইয়েও চলে আসে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের গল্প। এই অজ্ঞতার কারণেই দেখা যায় মাওলানা সাহেব কিংবা মাসজিদের ইমাম গিয়ে এমন কোনো এনজিও'র অনুষ্ঠানে মোনাজাত ধরেছেন, যাদের প্রধান এজেন্ডাই হলো এলজিবিটির প্রসার। তাই এ আন্দোলনের বাস্তবতা ও হুমকি সম্পর্কে জানা এবং সমাজকে জানানো আবশ্যক।
ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মিশ্রণ আমাদের চোখের ওপর ছানি ফেলে রাখে। অধিকার, স্বাধীনতা আর প্রগতির বুলিতে মজে যাই আমরা। নতুন নতুন শব্দ আর আঙ্গিকে যখন বিকৃতির বয়ান তুলে আনা হয়, তখন তালগোল পাকিয়ে ফেলি। স্পষ্ট জিনিসও তখন অস্পষ্ট মনে হতে থাকে। এর আগে অনেক বিষয়ে এমন হয়েছে, হচ্ছে। দু চোখে দুই চশমার কাঁচ লাগিয়ে হাঁটতে থাকলে সামনেও হতে থাকবে। তাই মিশ্রণ বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ তাওহীদের লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাতে হবে দুনিয়ার দিকে।

পরিশেষে, আমাদের কে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন অন্য কে সচেতন করা অব্যাহত রাখতে হবে।

মসজিদ-মিম্বর থেকে এলজিবিটি ও সমকামিতা নামক বিষাক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।
সভা-সেমিনার, মাহফিলে সমকামিতার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। জনগণকে সচেতন করতে হবে।
আদ-সামুদের ঘৃণ্য দালালদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।
কুফর চিন্তা, কুফর ব্যবস্থা, কুফর আইন, কুফর সংস্কৃতি বর্জন করতে হবে।
নব্য আদ-সামুদদের সকল পরিকল্পনা রুখে দিতে কুফর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে না বলতে হবে। সর্বোপরি ইসলামি ব্যবস্থা দিয়ে জীবনযাপনের দাবি তুলতে হবে।
এটি প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব।
যতদিন মুসলিম ভূখণ্ডে কুফর ব্যবস্থা চলবে, ততদিন তারা নানারকম এজেন্ডা চাপিয়ে দিবে। তাই আমাদের এর স্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করা প্রয়োজন। কেবল খিলাফতব্যবস্থাই কুফর এবং তাদের এজেন্টদের সকল পরিকল্পনার জাল ছিন্ন করে উম্মাহকে এ নব্য জাহিলিয়্যাতের অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোতে ফিরিয়ে আনতে পারে।
এ লক্ষ্যে উম্মাহ যত কাজ করবে, তত শীঘ্রই মহান আল্লাহর বিজয়ের ওয়াদা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দিন।

উপসংহার

বর্তমান যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারবাদ। এর ইতিহাস ঘাটলে দেখতে পাই কিভাবে কিছু মানুষের বিকৃত চিন্তা ভাবনা থেকে এর উৎপত্তি। সেই ৪০০০ বছর পুরনো কওমে লূতের ঘৃণ্যতম পাপাচার যার কারনে আল্লাহ ঐ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন সেই সমকামিতার ই আরেক আধুনিক রুপ হলো ট্রান্সজেন্ডারবাদ। পশ্চিমাদের সৃষ্ট এই বিকৃতি আজ পুরো বিশ্ব কে গ্রাস করেছে। আমাদের সমাজ ও তার ব্যতিক্রম নয়।
কিছু মানুষের বিকৃত চিন্তার ফসল হিসাবে এই মতোবাদের সৃষ্টি হলেও, তার প্রসারে যুক্ত হয়েছে নানা উপকরন। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের যৌন বিপ্লব রফতানি করতে চায়। যৌনতার

ব্যাপারে তাদের ধারনা চাপিয়ে দিতে চায় বাকি বিশ্বের ওপরে। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র তার সম ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই বিকৃত এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে। বিকৃতির বিশ্বায়নের এই প্রকল্প এক নব্য উপনিবেশবাদ। যা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আমাদের সমাজ, চিন্তা দেহ ও আচরন কে। এর পেছনে রয়েছে পশ্চিমা পুঁজিবাদি সমাজের মিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের বানিজ্য। কিন্তু আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলো না বুঝেই তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছি। মানবাধিকার নামে তাদের বিকৃতির স্বীকৃতি দিচ্ছি। অথচ তারা নানা শব্দ ফাঁদ দিয়ে খুব সহজেই আমাদের বোকা বানিয়ে রাষ্ট্র যন্ত্রে প্রবেশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অধিকারের নামে আমাদের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে। পাঠ্যপুস্তক, মিডিয়া, নানা রকম সোশ্যাল একটিভিসম এর মাধ্যমে জনগণের ব্রেন ওয়াশ করে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে।

বিকৃতির এই ভয়াবহ অগ্রাসনে আমাদের বর্তমান তরুনসমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্ম নৈতিক অবক্ষয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে।

তাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কে রক্ষা করতে আমাদের মাঝে এখনই সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ, সমকামিতা সর্বপরী এলজিটিবিকিউ এর মতো বিকৃত মতোবাদে কখনোই ইসলাম সমর্থন করেনা। এগুলোতে বিশ্বাস করা বা সমর্থন জানানো সরাসরি আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করার শামীল। যার পরিনতি দুনিয়াতেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর পরকালে ভয়াবহ শাস্তি।

আল্লাহ আমাদের এই ভয়াবহ ফিতনা থেকে হেফাজত করুন।

হে আল্লাহ, মুসলমানদের তাদের জীবনব্যবস্থা উপলব্দ্ধি করার তাওফিক দিন। হে আল্লাহ আমাদের পাপগুলো, অক্ষমতাগুলো ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ, আমাদের পরিবারগুলো ও সমাজকে নব্য আদ-সামুদের পাপাচার থেকে হিফাজত করুন। আমাদের দুআগুলো কবুল করুন। হে আল্লাহ, আমাদের সবাইকে জান্নাতে একত্রিত করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমিন।

রেফারেন্স:

এই প্রবন্ধ রচনায় যে সকল বই ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে-

১। অবক্ষয়কাল- আসিফ আদনান
২। সমতার আড়ালে সমকামিতা মিশন- ডা. মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন
৩। ট্রান্সজেন্ডার (পশ্চিমা জীবনব্যাবস্থার বিষফল) - মো এ আর খান
৪। অভিশপ্ত রঙধনু- (মাকতাবাতুন নুর)
৫। ট্রান্সজেন্ডার: রংধনু সন্ত্রাস -ডা ইয়াদ কুনাইবি

৬। ফিকহ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার -মুফতি ফিদাউল্লাহ
৭। অভিশপ্ত ট্রান্সজেন্ডার- শায়েখ হাফেজ জুবায়ের মারজালভী।

৮। https://chintaporadh.com/

৯। https://gtaf.org/apps/quran